নজরুলের ছোটগল্প, উপন্যাস ও নাটক

আবদুর রউফ চৌধুরী

'ছোটগল্প বা উপন্যাসের ক্ষেত্রে নজরুল হয়ত অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের দাবী করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহার রচনার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গিমা এই রচনাগুলিকেও দিয়াছে এক অনন্য সাধারণ অভিনবত্ব ও আকর্ষণ।' – আবুল ফজল।

'নিন্দা করাই যাঁদের উদ্দেশ্য, তাঁদের আর কোনো ছল খুঁজতে হয় না। অতি আধুনিক পর্যায়ভুক্ত সকল রচনার মধ্যেই যে তাঁরা নিন্দার কারণ দেখতে পেতেন, তা নয়, কিন্তু দেখতে চান বলেই দেখতে পান। ব্যঙ্গ ও কটূক্তি করবার জন্যই তাঁরা উন্মুখ, তাই অনিন্দনীয় যে কিছু থাকতে পারে, এ-কথা তাঁরা আমলেই আনতে চান না।' – বুদ্ধদেব বসু।

নজরুল তিনটি ছোটগল্পের গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন– 'ব্যথার দান'[১], 'রিক্তের বেদন'[২] ও 'শিউলিমালা'[৩]। তিনটি গ্রন্থে মোট আঠারোটি গল্পের মাধ্যমে প্রেম, বিচ্ছেদ, বিরহ, প্রেমকর্তব্যের সংঘাতে সৃষ্ট ট্র্যাজেডি, মৃত্যু, যুদ্ধযাত্রা, দেশের প্রতি প্রবল আকর্ষণ, দেশ ও জাতির মুক্তির কথা– অর্থাৎ রোমান্টিকতা প্রকাশ পেয়েছে। নজরুল ছিলেন সকল অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপসহীন বিদ্রোহী কবি। একজন অনন্য অসাধারণ শিল্পী। একজন যুগস্রষ্টা। একজন বলিষ্ঠ শক্তিধারী পুরুষ। তিনি সত্যের তূর্যবাদক, ঈশ্বরের হাতের বীণা। তিনি গর্বিত। তিনি দুঃখিত। তিনি বিত্তবান। তিনি নির্ধন। তিনি স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখে যাওয়া সৃজনকারী আত্মমুগ্ধ নায়ক। নজরুলের ছোটগল্পে তাঁর মাতৃঋণ, স্বদেশের ঋণ শোধ করার উন্মাদনা ও আদর্শায়িত একটি মাতৃমূর্তির অন্বেষণ প্রকাশ পেয়েছে, যা ছিল কবির কাছে 'জগজ্জননীস্বরূপা মা'।

নজরুলের প্রথম সাড়াজাগানো রচনাটি ছিল ছোটগল্প, কবিতা নয়। 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের ছোটগল্প 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'[৪] গল্পটি পাঠক ও সুধী সমালোচক মণ্ডলীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রচনার

[১] প্রথম প্রকাশ: ফাল্গুন ১৩২৮, মার্চ ১৯২২।
[২] প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৩১, জানুয়ারী ১৯২৫।
[৩] প্রথম প্রকাশ: কার্তিক ১৩৩৮, অক্টোবর ১৯৩১।
[৪] সওগাত, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩২৬।

ভাষা, আঙ্গিক ও রূপনীতির স্বাতন্ত্র্যের কারণে নজরুল প্রশংসিত হন। নজরুলের প্রকাশিত প্রথম কবিতা 'মুক্তি'র চেয়ে 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' হয়ে ওঠে অনেক গুণে পরিপক্ত ও শক্তিশালী। ১৩২৬ খ্রিস্টাব্দের জৈষ্ঠ্য সংখ্যা 'সওগাত'-এ প্রকাশিত 'বাউন্ডেলের অত্মাকাহিনী' নজরুলের সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা। এই রচনাটিই পাঠকসমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'সওগাত'-এর সম্পাদক লিখেছেন,

> 'সওগাত' প্রকাশিত হবার প্রায় পরপরই (১৯১৮) নজরুল করাচী থেকে লেখা পাঠাতে শুরু করেন– প্রচুর লেখা। লেখার সঙ্গে থাকতো চিঠি– অনেকগুলি লেখা বাতিল হওয়ার পর 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' হাতে আসে ডাকের মাধ্যমে। গল্পটি 'সওগাতে' প্রকাশিত হওয়ার পর এর প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো।[৫]

নজরুল বাংলাসাহিত্যের জগতে শুধু কবিতার জন্যেই নয়, ছোটগল্পের জন্যেও তিনি যুগস্রষ্টা। তাঁর ছোটগল্পে কবিতার মত শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর বহন করে। প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ডে অর্থাৎ প্রচলিত ছোটগল্পের আঙ্গিক ও রূপনীতির কাঠামোতে ফেলে কিংবা রচনার সৃষ্টির প্রচলিত শিল্পরূপে বিচার করতে গেলে নজরুলের ছোটগল্পের প্রকৃতি ও চরিত্র নির্ণয় বা মূল্যায়ন করা খুবই দূরুহ। নজরুলের প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প প্রমাণ করে যে, ছোটগল্পের লেখক হিশেবেই নজরুল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পণ্ডিতজনের মতে নজরুলের ছোটগল্পেও মানবতাবাদ, দেশপ্রেম ও নিবিড় বিদ্রোহের পরিচয় পাওয়া যায়, তবুও নজরুল মূলত কবি; অন্ত্যত তাঁর খ্যাতি কবি ও রাগ-রাগিণীর স্রষ্টা হিশেবেই– একথা অস্বীকার্য। একথাও স্বীকার্য যে, তাঁর খ্যাতি ছোটগল্পকার হিশেবেও পাওয়া উচিত। করাচি সেনানিবাসে রচিত 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী', 'স্বামীহারা', 'হেনা', 'ব্যথার দান', 'মেহের নেগার', 'ঘুমের ঘোরে' গল্পসমূহে অভিমানের প্রকাশ অধিক, ঠিক তেমনি দাবীও। বিদ্রোহী ও প্রেমিক– এই দুটি কবিসত্তা তাঁর ছোটগল্পগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। নজরুলের তেজস্বিতার পরিচয় খুবই উদ্দীপ্ত, অর্থাৎ 'শক্তিসুন্দর'-এর প্রকাশ সার্থক। নজরুল লিখেছেন, 'আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোটগল্প হয়ে, তারপর এলেন কবিতা হয়ে। তারপর এলেন গান, সুর, ছন্দ ও ভাব হয়ে। উপন্যাস, নাটক, লেখা [প্রবন্ধ-নিবন্ধ] হয়েও মাঝে মাঝে এসেছিলেন।'[৬] নজরুল তাঁর 'আমার সুন্দর'-শীর্ষক প্রবন্ধে বিচিত্রভাবে সুন্দরকে চিহ্নিত করেছেন; যথা– শক্তিসুন্দর, অন্তরতম-সুন্দর, প্রকাশ-সুন্দর, শোক-সুন্দর, স্নেহ-সুন্দর, শিশু-সুন্দর, প্রলয়-সুন্দর, সংহার-সুন্দর, ধ্যান-সুন্দর, স্বর্ণ-সুন্দর, ধরিত্রী-সুন্দর, পূর্ণশ্রী-সুন্দর, আনন্দ-সুন্দর, আমার-সুন্দর, পুষ্পিত-সুন্দর, সৃষ্টি-সুন্দর এবং বিষ-সুন্দর। সুন্দরের সৃষ্টির শক্তি নিয়ে নজরুল, শৈল্পিক দৃষ্টিতে, তাঁর শিল্পজীবন ও শিল্পবোধের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিলেন; তাঁর সমস্ত সাহিত্যজগৎ ও শিল্পাঙ্গিকের সঙ্গে সুন্দর অবলীলায় অঙ্গীকৃত হয়েছে। তিনি তাঁর সমস্ত রসতাত্ত্বিক ও সৌন্দর্যতাত্ত্বিক সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতাবোধের সমন্বয় ঘটিয়ে, তাঁর অনুভূত সুন্দরকে সামগ্রিকভাবে চূড়ান্ত রূপ দিতে, সৌন্দর্যের অপার্থিব জগৎ সৃষ্টি করেছেন, ফলে তাঁর সাহিত্যকর্মে ফুটে উঠেছে অভিজ্ঞতালব্ধ আবেগ ও অনুভব। কবি ও কথাসাহিত্যিক নজরুলের রচনা মূল্যায়ন করতে হলে মনে রাখতে হবে, ছোটগল্প শুধু কল্পনা নির্ভর কোনও শিল্পকর্ম নয়; সমাজ ও জীবন নির্ভরতায় এ মূল্যবান ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

নজরুল তাঁর ছোটগল্পগুলি দেশী-বিদেশী উভয় পটভূমিকায় সৃষ্টি করেছেন। কাহিনী ও চরিত্র আহরণ করেছিলেন স্বদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ, ভারত উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চল বা বর্তমান পকিস্তান থেকে; আবার বিদেশ অর্থাৎ আফগানিস্তান ও ইরাক থেকেও, এরসঙ্গে যুক্ত করেছিলেন কল্পনা এবং ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা। যৌবনে সৈনিক হিশেবে উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে— বর্তমান পাকিস্তানের করাচিতে অবস্থানকালে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন এসবই তাঁর কোনও কোনও গল্পে উপজীব্য হয়েছে। অল্পবয়সী যুবকের দুরন্তপনা, খামখেয়ালি যেমন অনেক গল্পে উপজীব্য হয়েছে তেমনি প্রেমের একাগ্রতা এবং মানবিকতাও মর্মস্পর্শী রূপে প্রকাশ পেয়েছে; তবুও নজরুলের ছোটগল্পে রোমান্টিকতা– প্রেম বা প্রেমের গভীর অনুভূতি, মানাভিমান ও ব্যর্থবিস্বাদই প্রাধান্য পেয়েছে।

---

[৫] 'সওগাত ও নজরুল ইসলাম', সওগাত, বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য ১৩৮১।
[৬] 'আমার সুন্দর', কাজী নজরুল ইসলাম।

মৌলিক কবিপ্রতিভা ও সৃজন ক্ষমতার অধিকারী নজরুল তাঁর ছোটগল্পে নিয়ে এসেছিলেন কবিতার আবেগানুভূতি, অভিজ্ঞতালব্ধ চিন্তাচেতনা ও সুগভীর জীবনবোধের বাস্তবতা। তিনি তাঁর জীবন থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেই ছোটগল্পের জগৎ নির্মাণ করেছিলেন। অবশ্য হৃদয়ধর্মীতার সঙ্গে মননশীলতার সমন্বয় সাধনে। নজরুল তাঁর ছোটগল্পের জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন সমকালীন, চিরন্তন ও চিরকালীন বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে– অর্থাৎ সমসাময়িক কাল, সমাজ, পরিবেশ ও জীবন তাঁর রচনায় 'ইরানি গোলাপের' মত পরিস্ফুটিত– সমকালীনতা বা সাময়িক ছাপ অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বজনীন রূপও নিয়েছে। বিষয়, কাহিনী বা চরিত্র সংগ্রহের ব্যাপারে নজরুলের শক্তি অবশ্যই স্বাতন্ত্র্যধর্মী, তাই সামগ্রীক শিল্পরূপ নিয়ে নজরুলের ছোটগল্পের জগৎ হয়ে উঠেছে আবেদনশীল ও চমৎকার। নজরুল তাঁর ছোটগল্পগুলিতে কাহিনী বা আখ্যানভাগ বর্জন করেননি, বা গল্পে প্রথাগতভাবে সর্বত্র তা অনুসরণও করেননি। প্রথাগতভাবে কাহিনী বিন্যাস; অর্থাৎ যাকে বলে শুরু থেকে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং নাটকীয়ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটানো, সে বাঁধা ছকে পুরোপুরিভাবে অগ্রসর হতে নজরুল কখনও মনে করেননি। কাহিনী ও চরিত্র চিত্রণের সঙ্গে কবি ও কথাসাহিত্যিক নজরুল আংশকিভাবে, সমগ্রভাবে, সত্যভাবে, নানাভাবে চরিত্রের মন, মনোবেদনা ও আবেগানুভূতিকে প্রকাশের জন্য সূক্ষ্মদৃষ্টি রেখেছেন।

একজন লেখকের স্বাতন্ত্র্যতা প্রকাশ পায় তাঁর ব্যবহৃত ভাষা ও ভঙ্গিতে; কথাসাহিত্য হোক বা কাব্যই হোক– কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধনিবন্ধ যাই রচনা করা হোক-না কেন সবকিছুতেই ভাষার প্রয়োজন পড়ে, তাই ভাষাই লেখকের আত্মপ্রকাশের অবলম্বন; একইসঙ্গে ভাব, ভঙ্গি বা বিষয়ের প্রসঙ্গটিও গোপন থাকে না, তাই স্বাতন্ত্র্যধর্মী ভাষা ও শিল্পশৈলীর প্রসঙ্গটি আসেই। 'বসুমতী' লিখে, 'কাজী নজরুলের [...] গদ্য রচনার মধ্যেও [...] মৌলিকতা আছে। ইহার ভাব ও ভাষায় প্রাণ আছে।'[৭] স্বাতন্ত্র্যধর্মী ভাষা ও শিল্পশৈলীর নিবন্ধে নজরুল তাঁর নিজস্ব ছোটগল্পের জগৎটি গড়ে তুলেছিলেন, এমনকী তাঁর উপন্যাস-প্রবন্ধ-নিবন্ধ-ভাষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ভাষা ও আঙ্গিকের দিক থেকে এক বিমূর্তমিশ্রণরূপের পরিচয় পাওয়া যায়; একইসঙ্গে কাব্যমণ্ডিপোদানের প্রভাবও তাঁর সৃজনশীল কথাসাহিত্যের সৌরলোকের গ্রহ-উপগ্রহে পরিলক্ষিত হয়, যা এক ধরণের রাগ-রাগিণী সৃষ্টি করেছে বলে মনে হয়। নজরুলের গল্পে কাব্যধর্মীতা, আবেগ-উচ্ছ্বাস অনেক ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেলেও এ লক্ষণীয় যে, ভাব বা বক্তব্য, বিষয় বা প্রকৃতি সৃষ্টিতে তিনি স্বাতন্ত্র্য ও ভিন্নধর্মী। 'বসুমতী' লিখে, 'কাজী নজরুল ইসলাম বাঙলার সাহিত্য সমাজে অপরিচিত নহেন। তাঁহার স্বদেশ প্রেমের উদ্দীপনার কবিতা বাংলা কাব্য সাহিত্যে এক অভিনব রস-সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু তিনি যে বাঙলা গদ্যেও সিদ্ধহস্ত, তাহা জানা ছিল না।'[৮] নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, গল্পে– ভাব, বক্তব্য, কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে নজরুল যে অন্যরকম সৃজনপরিধি, প্রকৃতি ও শিল্পরূপ নির্মাণ করেছেন তা একান্তই নজরুলীয়। 'স্বরাজ' লিখে, 'কাজী নজরুল ইসলাম এতদিন কবিতা লিখিয়াই যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু গদ্যের জন্যেও যে তিনি পুরাদস্তর সাধনা করিয়াছিলেন এই গ্রন্থখানিতে [ব্যথার দান] তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ আছে, গদ্যের ভিতরেও যে একটা ছন্দ আছে, একটা মাত্রা আছে, কাজী নজরুল ইসলামের এই বইখানি পড়িলে তাহা অতি সহজেই ধরা পড়ে। এক কথায়, বইখানির ভাষা ছন্দময়, প্রকৃতির ভিতরকার রূপ এবং রস পুঞ্জীভূত হইয়া তাহার লেখার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকারের লেখার ভিতর একটা উদ্দামতার ছাপ সর্বত্রেই সুস্পষ্ট। গ্রন্থকার সাহসী এবং নির্ভীক, কনভেনশন বা অন্ধ সংস্কারকে তিনি পদে পদে দলিয়া চলিয়াছেন।'[৯] নজরুলের 'ব্যথার দান' ও 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের অন্তগর্ত কিছু গল্পে যেমন কবিত্বমণ্ডিত ভাষায় আবেগাকুল কবির মনের কথা গভীরভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে তেমনি 'শিউলিমালা'র কিছু কিছু গল্পে অতিপ্রকৃতির পটভূমিকায় রূপ পেয়েছে শিল্পসৌন্দর্য। কবিত্বময় আবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে 'ব্যথার দান' ও 'রিক্তের বেদন'-এর অন্তর্গত কোনও কোনও গল্পে বাঙালি ছোটগল্প রচিতাসূলভ নির্লিপ্তভাব রক্ষিত হয়নি, তবে পশ্চিমা বিমূর্তরচনা শৈলীর আঙ্গিক উপলব্ধি করা যায়। মানবতাবাদ ও দেশপ্রেম নজরুলকে ছোটগল্পের আদল থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেও

[৭] বসুমতী।
[৮] বসুমতী।
[৯] 'ব্যথার দান' সম্পর্কে, স্বরাজ, ১৩৩১।

ভাব ও ভাষার ক্ষেত্রে এক ধরণের প্রাণ আছে। আবুল ফজল বলেছেন, '[...] 'ব্যথার দান' ও 'রিক্তের বেদন'-কে গদ্য ভাষায় কবিতা বলিলেও বিশেষ অতুক্তি করা হইবে না। তরুণ কবির প্রথম যৌবনের আবেগ, ব্যথা-বিরহ, মান-অভিমান ও চঞ্চল মনের নানা আকুলি-বিকুলি এক অভিনব কবিত্বমণ্ডিত ভাষায় এই দুই গ্রন্থের গল্পগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।'[১০] আর বিভিন্ন পত্রপত্রিকা বলেছেন, 'কাজী নজরুল ইসলামকে আমরা প্রতিবান নবীন কবি বলিয়াই জানিতাম। তাঁহার এই বইখানি পড়িয়া বুঝিলাম যে, গদ্য-সাহিত্যেও তিনি সমান কৃতী।'[১১] 'প্রেমের এবং বিরহের, আগেকার এবং আশঙ্কার নায়ক এবং নায়িকার নানারূপ বিচিত্র মনোভঙ্গী রঙ্গীন তুলিকায় চিত্রিত। প্রেমোন্মাদ এবং ভাবোন্মাদের বিচিত্র ভঙ্গীর ন্যায় ভাষাও ইহার বিচিত্র ভঙ্গী শালিনী, রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুকরণনে অনুরঞ্জনী।'[১২] '[...] তরুণ কবির ব্যথাভারাতুর যৌবনের অর্দ্ধনগ্ন স্মৃতির রাগরক্তে অনুরঞ্জিত কাহিনী এই কাব্যের [ব্যথার দানের] কথা-বস্তু। সমস্ত কাহিনীগুলির উপর মৃত্যুর মসীগাঢ় ছায়া নিদারুণ ভবিতব্যের মত রহিয়াছে। তাই সেই ছায়ার অবগুণ্ঠনে প্রেম-করুণ হৃদয়ের ব্যথা-ক্রন্দন আপনি করুণ হইয়া উঠিয়াছে।'[১৩] নজরুলের ছোটগল্পে যে গ্রামীণ শব্দাবলী, ইতিময় ও বাকভঙ্গী, লোকজঐতিহ্য এবং গ্রামীণ মানুষের সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে মূলত তা কৈশোরে গ্রামাঞ্চলে বিশেষত ময়মনসিংহের কাজীর শিমলা ও দরিরামপুরে অবস্থান কালের অভিজ্ঞতার উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। উপভাষা সম্পর্কে নজরুলের সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় 'রাক্ষুসী' বীরভূমের বাগদীদের ভাষায় লেখা। কোনও কোনও রচনায় তিনি আত্মমুগ্ধ আবার কোনও কোনও রচনায় তিনি সমাজপ্রবুদ্ধ; চিত্রকল্পের ঐশ্বর্যে তাঁর কল্পনার পরিচয়ও পাওয়া যায়। উপমায় আছে এক বিচিত্র বর্ণালী শোভাযাত্রা, অতিস্বাভাবিকভাবে মাঝেমধ্যে আবার অতিকথনের রূপও, তবে মনোমুগ্ধকর রূপেই। উপমার শোভাযাত্রার পাশাপাশি অবিরাম চলেছে শব্দের কলকল্লোল, অনুপ্রাস ও শব্দমিলের ঝঙ্কার; চিত্রকল্পের পরিপূরকই তাঁর শব্দের ব্যবহার। এছাড়াও আরবি-ফারসি শব্দ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন তিনি।

সৃষ্টিধর্মী লেখককে ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে কল্পনাশ্রীয় না-হয়ে বাস্তবজীবনের স্পর্শে সাহিত্য রচনা করা প্রয়োজন, কেননা ছোটগল্পের জমিনে বাস্তবসমাজের সঙ্গে কল্পনাশ্রীয় ছবি সহাবস্থায় বসবাস করে– অর্থাৎ বাস্ত বসমাজ থেকে কাহিনী ও চরিত্র আহরণ করে সৃষ্টিধর্মী লেখক তাঁর কল্পনা, আবেগানুভূতি ও জীবনবোধের সহায়তায় এক নতুন জগৎ সৃজন করেন, আবার কাব্যধর্মীও, ফলে একজন কবির হাতে সৃষ্ট ছোটগল্পেও কাব্যমণ্ডিতস্বরূপ লক্ষ্য করা তেমন অন্যায়ের কিছু না, যেমন ঘটেছে নজরুলের ক্ষেত্রে; 'দৈনিক মোহাম্মদী' বলে, 'কাজী সাহেবের প্রতিভা অসাধারণ। তাঁহার লিখিবার ভঙ্গিমা চমৎকার। আলোচ্য বইখানিতে [ব্যথার দান] তাঁহার লেখনীর সেই চমৎকারিত্ব ও অসাধারণত্ব অক্ষুণ্ন আছে।'[১৪]

'অরণী' লিখে, 'বাঙালার কাব্যজগতে রবীন্দ্র-মানসের প্রাবল্যের যুগেও যিনি আপন স্বকীয়তায় জাতীয় কবির সম্পূর্ণ এক নূতন তেজস্বী ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। কবি নজরুলকে সেইভাবেই বাঙলাদেশ চিনে এবং বিশিষ্ট আসন দেয় [...]।'[১৫] ছোটগল্প রচনায় নজরুল তাঁর আবেগ-গভীর-অনুভূতিসমৃদ্ধ কবিমনের প্রকাশ ঘটিয়ে মানবচরিত্রের গূঢ়রহস্য এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। নজরুলের হাতে সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাগুলিও ছোটগল্পে শৈল্পীক আধারে ও আঙ্গিকে সযত্নে বিধৃত হয়ে উঠেছে। নজরুলের গল্পের নায়ক-নায়িকা জাতি-ধর্ম-সমাজের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব ও বৈসাদৃশ্যকে আঘাত করে, জীবনকে বাস্তবতার প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক করে নিতে সংগ্রামী প্রচেষ্টায় মুখর হয়েছে। নজরুলের কিছু কিছু গল্পের নায়ক কিন্তু নজরুল নিজেই, তাই তাঁর এসব ছোটগল্পে নিজস্ব ব্যক্তিমনের ভাবানুভূতি, প্রেম, প্রকৃতি ও মানুষের অন্তঃকরণ বেদনাই প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজের কথা যখন ভাবে তখন নজরুলের নায়করা সত্যসন্ধানে অসামাজিক জীব,

[১০] নজরুল রচনা-সম্ভার, কলিকাতা, ১৩৭৭।
[১১] বিজলী, ১৩৩১।
[১২] বঙ্গবাণী, ১৩৩১।
[১৩] আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৩৩১।
[১৪] দৈনিক মোহাম্মদী, ১৩৩১।
[১৫] অরণী।

একইসঙ্গে আত্মপ্রেমিকও বটে। মানুষের সাধনা পূর্ণ করার সাধ– এ ছিল তাঁর প্রাণগত বিশ্বাস, মনুষ্যত্বের বিকাশ ও প্রকাশ, তাই আবেগের তাড়নায় কবির আত্মোন্মোচনের যে-ছবি লক্ষ্য করা যায় এতে নজরুলের ব্যক্তিমনের নানা ভাবানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। কবি সমালোচক ও প্রখ্যাত নজরুল গবেষক আব্দুল কাদেরের ভাষায়, 'নজরুলের প্রথম জীবনের 'রিক্তের বেদন' ও 'ব্যথার দান'-এর গল্পগুলোতে চরিত্র সৃষ্টি ও ঘটনার স্থান বা সংস্থান বড় কথা নয়; আবেগের প্রগাঢ়তা ও কল্পনার ঐশ্বর্যে এগুলো মনে আনে স্বপ্নাবেশ। তরুণ প্রেমের উদ্ভ্রান্ত উচ্ছ্বাস ও বিরহী চিত্তের ব্যাকুল স্পন্দন এগুলোকে করেছে রস-মধুর ও হৃদয়গ্রাহী। তার 'বাদল বরিষণে', 'সাঝেঁর তারা', 'দুরন্ত পথিক' প্রভৃতি যেন ভাষা ও বর্ণনার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে। তার পরিণত বয়সের রচনা 'শিউলিমালা'র গল্পগুলো আঙ্গিক এবং বাচনভঙ্গীর বিচারে অপেক্ষাকৃত অনবদ্যর।'[১৬] 'শিউলিমালা' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিতে কিন্তু আবেগের অতিরেক নেই। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতেই চরিত্রের জীবনে প্রবেশ করেছেন কবি। আশাকরি সকল পণ্ডিতই স্বীকার করবেন যে, কবি নজরুল তাঁর রচিত স্বল্প সংখ্যক ছোটগল্পেই বলিষ্ঠ কথাসাহিত্যিকসুলভ সৃজনক্ষমতা ও স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন আমাদের জন্যে।

[১৬] 'যুগ-কবি নজরুল', আবদুল কাদির, ঢাকা, ১৯৮৬।

ব্যথার দান

'কাজী নজরুল ইসলামকে আমরা প্রতিভাবান নবীন কবি বলিয়াই জানিতাম। তাঁহার এই বইখানি [ব্যথার দান] পড়িয়া বুঝিলাম যে গদ্য সাহিত্যেও তিনি সমান কৃতী।'[১৭]

'প্রেমের সোনার কাঠির পরশ সৈনিকের চিত্তকেও কোমল রসমধুর করিয়া তোলে, তাহারই পরিচয় আমরা 'ব্যথার দানে'র অধিকাংশ গল্পতেই পাই, ভাষার এমন প্রাণশক্তি, এত মাদকতা সত্যকার উচ্ছ্বাসেই সম্ভব।'[১৮]

'[...] 'ব্যথার দান' অবশ্য কবি-মনের আর এক প্রকাশ। 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' যে হিসাবে বাঙলা সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং যেভাবে বিদগ্ধজনকে মুগ্ধ করে, 'ব্যথার দান'-এর রসের আবেদন তাহাই। কবি মনের এবং শিল্পীর রঙের সমস্ত কমনীয়তা লইয়া বাঙলার সমতল-ক্ষেত্রে গোলেস্তা চমন্। বেলুচিস্থানের আখরোট-ডালিমের বন এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে অনস্বীকার্য। কর্মক্লান্ত জীবনের মাঝখানে অবসর-লালায়িত নিভৃত একটা মন আছে– সেখানে কবির বিরহ মিলন কাহিনীর সার্থক আবেদন মুক্তা আনে আর এক কালের, আর এক জগতের।'[১৯]

নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গল্প-সংকলনটি হচ্ছে 'ব্যথার দান'[২০]; গল্পগুলি হচ্ছে: 'ব্যথার দান'[২১], 'হেনা'[২২], 'বাদল বরিষণে'[২৩], 'ঘুমের ঘোরে'[২৪], 'অতৃপ্ত কামনা'[২৫] ও 'রাজবন্দীর চিঠি'[২৬]।

'ব্যথার দান': গল্পটির আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এতে বর্ণিত ব্যক্তিপ্রেম ও দেশপ্রেম। সমাজের নিচুতলার মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি স্বদেশচেতনার মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলিত করেছেন। দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে জন্মদাতা মা ও দেশমৃত্তিকা মায়ের একটি সূক্ষ্মচিত্রের মাধ্যমে। জন্মদাতা মায়ের স্নেহ একটি মস্ত বড় শিকল, যে শৃঙ্কল না-ভাঙলে দেশমৃত্তিকা মা'কে চেনা যায় না, তবে জন্মদাতা মা'কে ছোট করে নয়, বরং মা'ই দেশমৃত্তিকা মায়ের জায়গা দখল করে নেন। এসব কথাই নায়ক দারাকে দিয়ে নজরুল সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন,

> দু-একদিন ভাবি, হয়তো মায়ের এই অন্ধ স্নেহটাই আমাকে আমার এই বড় মা দেশটাকে চিনতে দেয়নি। বেহেশত্ থেকে আব্দারে ছেলে কান্না মা শুনতে পাচ্ছেন কি-না জানি নে, কিন্তু এ আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি যে, মাকে হারিয়েছি ব'লেই মাতৃ-স্নেহের ঐ মস্ত শিকলটা আপনা হ'তে ছিঁড়ে গিয়েছে ব'লেই আজ মা'র চেয়েও মহীয়সী আমার জন্মভূমিকে চিনতে পেরেছি। তবে এও আমাকে স্বীকার করতে হবে, মাকে আগে আমার প্রাণ-ভরা শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসা অন্তরের অন্তর থেকে দিয়েই আজ মা'র চেয়েও বড় জন্মভূমিকে ভালবাসতে শিখেছি। মাকে আমি ছোট ক'রছি নে। ধ'রতে গেলে মা-ই বড়।[২৭]

---

[১৭] আত্মশক্তি।
[১৮] বাঙলার কথা।
[১৯] অরণী।
[২০] টীকা: প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯২২, কিন্তু সরকারি নথি অনুসারে ১লা মার্চ ১৯২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা– ১৪৭, মূল্য– দেড় টাকা, প্রকাশিত সংখ্যা– ১,১০০ কপি, প্রিন্টার– শ্রীশশিভূষণ পাল, মেটকাফ প্রেস, ৭৯ বলরাম দে স্ট্রিট, কলিকাতা, প্রকাশক– এম. আফজাল-উল হক, মুসলিম পাবলিশিং হাউজ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
[২১] পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ: 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', মাঘ ১৩২৬ বঙ্গাব্দ।
[২২] পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ: 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', কার্তিক ১৩২৬ বঙ্গাব্দ।
[২৩] পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ: 'মোসলেম ভারত', শ্রাবণ ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।
[২৪] পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ: 'নূর', ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৬ বঙ্গাব্দ।
[২৫] পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ: 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', শ্রাবণ ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।
[২৬] পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ: অপ্রকাশিত।
[২৭] 'ব্যথার দান', কাজী নজরুল ইসলাম।

সামাজতান্ত্রিক চেতনা নজরুলের স্বদেশচিন্তার একটি বৈশিষ্ট্য, এরসঙ্গে জড়িয়ে আছে আন্তর্জাতিকতাও। দারা ও সয়ফুল মুলক ককেশাসে গিয়ে 'লালফৌজ'-এ যোগদান করে অত্যাচারির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। সয়ফুল মুলকের কথা,

> [...] ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই লালফৌজে[২৮] যোগ দিলুম। এ পরদেশীকে তাদের দলে আসতে দেখে এই সৈন্যদল খুব উৎফুল্ল হয়েছে। এরা মনে ক'রছে, এদের মহান নিঃস্বার্থ ইচ্ছা বিশ্বের অন্তরে অন্তরে শক্তি সঞ্চয় ক'রছে। [...] তারা উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রছে এবং আমিও সেই মহান ব্যক্তি সঙ্ঘের একজন।[২৯]

নজরুল 'রুশ বিপ্লব' সম্বন্ধে নিষিদ্ধ সাহিত্য সংগ্রহ করেছিলেন। এমনকী তিনি 'রুশ বিপ্লব' নিয়ে আলোচনা এবং 'লালফৌজের দেশপ্রেম' নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে একটি উৎসবের আয়োজন করে ছিলেন। জমাদার শম্ভু রায় বলেছেন, 'নজরুল তার বন্ধুদের মধ্যে যাদের বিশ্বাস করত তাদের এক সন্ধ্যায় খাবার নিমন্ত্রণ করে, অবশ্য এইরকম নিমন্ত্রণ প্রায়ই সে তার বন্ধুদের করত। কিন্তু ঐ দিন যখন সন্ধ্যার পর তার ঘরে আমি ও নজরুলের অন্যতম বন্ধু তার অরগ্যান মাস্টার হাবিলদার নিত্যানন্দ দে প্রবেশ করলাম তখন দেখলাম অন্যান্য দিনের চেয়ে নজরুলের চোখে মুখে একটা অন্য রকমের জ্যোতি খেলে বেড়াচ্ছিল। উক্ত নিত্যানন্দ দে মহাশয়ের বাড়ী ছিল হুগলী শহরের ঘুটিয়া বাজার নামক পল্লীতে। তিনি অরগ্যানে একটা মার্চিং গৎ বাজানোর পর নজরুল সেই দিন সেসব গান গাইল ও প্রবন্ধ পড়ল তা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে রাশিয়ার জনগণ জারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। গান বাজনা প্রবন্ধ পাঠের পর রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং লালফৌজের দেশপ্রেম নিয়ে নজরুল কুব উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এবং ঠিক নাম মনে নেই সে গোপনে আমাদের একটি পত্রিকা দেখায়। ঐ পত্রিকাতে আমরাও বিশদভাবে সংবাদটি দেখে উল্লসিত হয়ে উঠি। সে দিন সারা রাতই হৈ হুল্লড়ে আমাদের কেটে গিয়েছিল।'[৩০]
'ব্যথার দান' গল্পে প্রেমের মর্যাদা ও হৃদয়সমস্যা বিশ্লেষিত হয়েছে। নজরুল বহুশ্রুত শিল্পী। জীবন ও যৌবনের কথা এগল্পে সুস্পষ্টভাবে সমাহৃত হয়েছে। ভাষা ও কাহিনী আবেগপূর্ণ, প্রেমে একটি করুণ-বিরহের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

মূলকাহিনী: নায়ক দারা বেলুচ যুবক। নায়িকা বেদৌরা। সে পিতৃমাতৃহীন। ছেলেবেলা থেকেই সে দারার মা দ্বারা লালিতপালিত। দারার মা পরম স্নেহময়ী; তাই তিনি তার মৃত্যুর সময় দারাকে বলেন, 'দারা, প্রতিজ্ঞা কর– বেদৌরাকে কখনো ছাড়বি নে!' এরপর থেকেই দারা ও বেদৌরার প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক গাঢ় হতে থাকে। শব্দহীন মুহূর্তগুলি যেন দ্বিগুণ গভীর হতে থাকে। তাদের বুকের মধ্যে 'মুহুমুহু' কাঁপন সৃষ্টি হয়, তীব্র আনন্দটি তাদের বুকই বুঝতে পারে অন্যকিছু নয়। তাদের মিলনের মধুর অতৃপ্তি এরকমই বড় সুন্দর হয়ে জীবন-অধ্যায়ের পাতাগুলি উলটোতে থাকে, হঠাৎ সবকিছু উলটোপালটো হয়ে যায়, নিমিষে অস্থির হয়ে ওঠে দুটি প্রাণ। বেদৌরার এক মামা তাদের জীবনে এসে উদয় হন। তিনি জোর করেই দারার কাছ থেকে বেদৌরাকে ছিনিয়ে নিয়ে যান। ফলে তাদের প্রেম-ভালোবাসার বন্ধনে ছেদ পড়ে, সৃষ্টি হয় তাদের জীবনপ্রবাহের মাঝখানে একটি বিষাদের নিশ্চল প্রতিমা। সমস্ত গল্পের আত্মাটি যেন এই বিচ্ছেদেই ধরা পড়েছে। বেদৌরা চলে যাওয়ার পর দারার জীবন-জগৎ পরিবর্তন হতে থাকে। দারা ব্যাকুল হয়ে বেদৌরাকে খুঁজতে থাকে। সে খুঁজে বেড়ায় বেদৌরার ঝরণা পাড়ের কুটির, কিন্তু তার সন্ধান পায় না। বেদৌরা চলে গেছে চমন থেকে বোস্তানে। সেখানে তার পরিচয় ঘটে সয়ফুল নামের এক যুবকের সঙ্গে; একসময় সে ধরা পড়ে যায় সয়ফুলের 'কান-ভাঙানি'তে। 'পুষ্পিত যৌবনের ভারে' বেদৌরা ঢলে পড়ে সয়ফুলের দেহে, দেহেদেহে মিলন ঘটে, এ আনন্দ ক্ষণিকের, তারপর শুরু হয় যা হওয়ার তাই– হতাশা। বেদৌরা বুঝতে পারে দারা ছাড়া তার জীবনে আর কেউ নেই, তাই তার মনহৃদয় চঞ্চল হয়ে

---

[২৮] 'নজরুল ইসলাম যখন 'ব্যথার দান' গল্পটি আমাদের নিকট পাঠিয়েছিল তখন তাতে [...] লালফৌজে যোগ দেওয়ার কথাই [...] ছিল। আমিই তা থেকে 'লালফৌজ' কেটে দিয়ে তার জায়গায় 'মুক্তিসেবক সৈন্যদের দল' বসিয়ে দিয়েছিলাম।' – কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা, মুজফফর আহমদ, ১৯৬৫।
[২৯] 'ব্যথার দান', কাজী নজরুল ইসলাম।
[৩০] প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত জমাদার শম্ভু রায়ের পত্র, ১৯৫৭।

ওঠে। অন্যদিকে সয়ফুলের মন অনুতপ্ত, বেদৌরাকে পেয়েও পায়নি। দারা জানতে পারে বেদৌরার ঘটনাটি, যা শোনা মাত্র সে এক নিদারুণ আঘাত পায়। ব্যথিত হয়ে ওঠে তার মন, আর বুকের মেঘহীন আকাশে বজ্রাঘাত; যদিও সে নিজেকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চায়, বেদৌরার কোনও দোষ নেই, তবুও পারে না। সে বেদৌরাকে শত চেষ্টা করেও ক্ষমা করতে পারে না, তাই দারা বলে, 'যদি কোন দিন হৃদয় হতে ক্ষমা ক'রবার ক্ষমতা হয়, তবেই আবার দেখা হবে, নইলে এই আমাদের চিরবিদায়।' আত্মহত্যাও করতে চায় দারা, কিন্তু পারে না, শেষে ঘুরতে ঘুরতে যোগ দেয় লালফৌজে। ঘটনাক্রমে তাদের দেখা হয় সয়ফুলের সঙ্গে, সেও এ বাহিনীতে আশ্রয় নিয়েছে। তারপর দারা দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি হারায়। অন্ধ হওয়ার পরই তার অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়, কারণ, 'অন্ধেরও একটা দৃষ্টি আছে, সে হ'চ্ছে অন্তর্দৃষ্টি বা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি'। তখনই সে দেখতে পায় 'দুনিয়া-ভরা শুধু প্রিয়ার রূপ আর তারই হাসির অনন্ত আলো'; আর 'কালা কান' দুটি দিয়ে শুনতে পায় প্রিয়ার 'কানে-কানে-বলা গোপন-প্রেমালাপের মঞ্জু গুঞ্জন আর চরণভরা মঞ্জীরের রুণুঝুনু বোল!' অবশেষে দারা ফিরে আসে বেদৌরার কাছে, বলে, 'আমার অন্ধত্ব ও বধিরতা? ওর জন্য কেঁদো না বেদৌরা, এ-গুলি না থাকলে তো আমি তোমায় আর পেতাম না।'

'ব্যথার দান' গল্পটিতে নজরুলের এক বিশেষ উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বাইরের দৃষ্টি বন্ধ করে অন্তরের দৃষ্টি খোলার যুক্তি। পাপের জন্য প্রিয়ার প্রতি বিমুখ হওয়াই প্রেমিকের নব প্রেমদৃষ্টি লাভ হয়েছিল। প্রিয়ার বিরহে প্রেমিকের অন্তরে প্রেমদৃষ্টি উন্মীলনে সাহায্য করে ছিল তার অন্ধত্ব ও বধিরত্ব। অন্তরের করুণ রসের আবেদনই প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশ পেয়েছে তার অন্তরের ঐশ্বর্য, আর প্রতিশ্রুতি। প্রেমের উন্মীলনে অন্তরের সম্পদ যে গোপনে গভীরে অশ্রুর প্রেরণা যোগায়, দেহের আধারে সে উন্মেষ যে সম্ভব নয়, তারই উপলব্ধিটি এখানে প্রত্যক্ষ করা যায়। নজরুলের এই উপলব্ধি বাস্তবজীবনে অনাবৃত না থাকলেও বাস্তবাতীত নয় বলেই মনে হয়। বিস্ময়বোধ হয় যে, নজরুল কেমন করে অন্ধ না-হয়ে অন্তঃদৃষ্টির উপলব্ধিতে বাস্তবতার সঠিক মাপকাঠি যাচাই করে একটি সত্য কথা প্রকাশ করেছিলেন, বোধহয় এ একমাত্র সম্ভব হয় নজরুলের বলিষ্ঠ কল্পনাশক্তির কারণেই।

'হেনা'[৩১]: যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত। 'ব্যথার দান'-এর দ্বিতীয় গল্প। 'কার্তিক মাসে (নভেম্বর, ১৯১৯) আমরা ছেপেছিলেম তার 'হেনা' নামক গল্প। [...] সে ফৌজে থাকা অবস্থাতে লিখেছিল, এবং লিখেছিল তার হাবিলদার হওয়ার পরে। [...] 'হেনা' [...] গল্পই প্রেমের গল্প। [...] গল্পের ভিতর দিয়েই অদ্ভূত দেশ-প্রেমও ফুটে উঠেছে।'[৩২] গল্পটির পটভূমিকা নজরুলের কিশোরজীবনের পরিচিত রাঢ়াঞ্চল থেকে শুরু করে কোয়েটা, পেশোয়ার ও কাবুল; আর অপরিচিত ফ্রান্স পর্যন্ত বিস্তৃত। এতে স্থান পেয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধের কোনও এক রণাঙ্গনের কাল্পনিক যুদ্ধচিত্রটিও। কামানের গোলা আর বোমা ফোটানোর শব্দ। গুড়ুম, গুড়ুম। দ্রুম, দ্রুম। লুইস্ গান, রাইফেল আর মেশিন গানের গুলিবর্ষণের আওয়াজ। শোঁ, শোঁ, শোঁ। সৈনিকের বুটের পদাঘাত, ঝ্পঝ্প, লাশের গন্ধ, মানুষের রক্ত, মানুষ মারার কুৎসিত নিষ্ঠুর গাঢ় নেশা, চিৎকার, মৃত্যু, দেশ ও জাতপাত, হাহাকার, ভার্দুন ট্রেঞ্চ, প্যারিসের সিন নদীর ধারের তাম্বু, ঘনবন, হিণ্ডেনবার্গ লাইন, বেলুচিস্থানের ছোট্ট কুটির, ডক্কা ক্যাম্প– ছবির পর ছবি– যেন বজ্রপ্রলয় চলছে দিনরাত। এ-গল্পে যুদ্ধ আর প্রেম সমান্তরাল প্রবহমান। এছাড়াও মেঘ ছিঁড়ে পূর্ণিমা চাঁদ ও নারীর বুকফাঁটা তৃষ্ণার আর্তনাদ– একটি চমৎকার বিমূর্ত শিল্পরূপের সন্ধানও,

> আগুন, তুমি ঝর– ঝম্ ঝম্ ঝম্! খোদার অভিশাপ তুমি নেমে এস ঐ নদীর বুকের জমাট বরফের মত হ'য়ে– ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্! ইস্রাফিলের শিঙ্গা, তুমি বাজো সবকে নিসাড় করে দিয়ে– ওম্ ওম্ ওম্! প্রলয়ের বজ্র, তুমি কামানের গোলা আর বোমার মধ্যে দিয়ে ফাট ঠিক মানুষের মগজের ওপর– দ্রুম্-দ্রুম্-দ্রুম্। আর সমস্ত দুনিয়াটা– সমস্ত আকাশ উল্টে ভেঙে পড় তাদের মাথায়, যারা ভালবাসায় কলঙ্ক আনে, ফুলকে অপবিত্র করে।[৩৩]

[৩১] 'কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা', মুজফফর আহমদ, ১৯৬৫।
[৩২] 'কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা', মুজফফর আহমদ, ১৯৬৫।
[৩৩] 'হেনা', কাজী নজরুল ইসলাম।

এ-গল্পে নজরুল নারীস্বাধীনতার একটি স্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তুলে ধরেছেন। আদর্শ ভালোবাসা তৈরি করতে গিয়ে একটি বিদেশী কিশোরীর দৃষ্টান্ত স্থান পেয়েছে।

> মেয়েটা আমাকে খুব ভালবেসেছে। আমিও বেসেছি। আমার দেশ হ'লে ব'লত মেয়েটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কুড়ি একুশ বছরের একজন যুবকের সঙ্গে কুমারীর মেলা-মেশা আদৌ পসন্দ ক'রত না![৩৪]

তার ভালবাসা এতই যে, যুদ্ধশেষে পেশোয়ারে ফিরে গেল তার দেখা হয়ে যায় হেনার সঙ্গে। কাবুলে আমীরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে তার দেহে পাঁচ-পাঁচটি গুলি প্রবেশ করলেও হেনাকে সে হারাতে পারেনি। এগল্পে নজরুলের ভাষারীতি যুদ্ধ আর প্রেমের অনুগামী।

'বাদল-বরিষণে': একটি সার্থক ট্র্যাজেডির গল্প। একটি কালো মেয়েকে ঘিরেই এর কাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছে। যুগ-যুগান্তর অন্বেষণ করার পর বিদেশী একটি কালো মেয়ে কাজরীকে নায়ক ভালোবাসে। তার 'হরিণীর মত ভীত ত্রস্ত চাউনি'। নায়ক অনেক জীবন খোঁজার পর তাকে পেয়েছে। কাজরী কিন্তু নায়কের স্নেহ-ভালোবাসা সইতে পারে না। কালোরূপের কারণে সমস্ত জীবন জুড়ে যতসব আঘাত-বেদনা তার বুকে জমা হয়ে আছে সেগুলি উপেক্ষা করতে সে পারে না, এ-যেন এক তীব্র অভিমান, তাই ত চারপাশ তাকিয়ে 'আচমকা' আর্ত আকুল কণ্ঠে সে কেঁদে ওঠে। এখানেই দৃষ্টিগোচর হয় কবির এক বিচিত্র বর্ণালী উপমা ও শব্দের। কজরী আর দাঁড়াতে পারে না, কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নেয়, কান্নাভরা অভিমানই তার ভালোবাসার আহ্বান যেন। হৃদয় দুর্জ্জয় বেগে হাহাকার করে ওঠে, গর্জ্জে ওঠে, তাই সে বলে, 'ওগো সুন্দর বিদেশী, আমি কালো।' তখনই গল্পের বয়ান ও উপাস্থাপনের ভঙ্গি বদলে যায়; বর্ণনায় আসে ভেজা মাটির গন্ধ, ময়ূরের কেকাধ্বনি, কেয়া-যুথী-বেলী-শিউলির ঝামেলা, শেফালী-বকুল ঝরার খেলা, কদম্ব-পদ্মের স্নিগ্ধ সুভাস, সবুজ ধান ও কচি ঘাস মাড়ানো বর্ষার আর্তনাদ; বর্ষার মেঘ, বিজুরী চমক ও বাদল বরিষণ কিছুই বাদ পড়ে না। বিদেশীর ভালোবাসাকে এড়িয়ে কাজরী সন্ধান পেতে চায় তার কালোরূপের স্রষ্টাকে, একদিন ঠিকই পেয়েও যায়, তার আত্মা পৌঁছে যায় কালোরূপের সেই স্রষ্টার কাছে, শুধু তার বাইরের শ্যামরূপটি, দেহটি, লুটিয়ে পড়ে ধরণী তলে। 'চাওয়ার অনেক বেশী পাওয়ার' গর্বেই বোধহয় নায়িকার অসময়ে মৃত্যু ঘটে; কিন্তু নায়ক তার প্রিয়তমাকে ফিরে পায় প্রকৃতির শ্যমলরূপটির মাঝে।

'ঘুমের ঘোরে': এক নিরাশ প্রেমিকের কাহিনী। গল্পটি শুরু হয় ঘুম ভাঙা দিয়ে, তারপর আস্তে আস্তে নিশি ভাঙে, ভোর হয়, বুলবুলি শিস দেয়, দোয়ার খোলে, ভ্রমর আসে; এরসঙ্গে 'দাদ্‌রা' তালের সঙ্গে নাচতে নাচতে কোয়েল, দোয়েল ও পাপিয়া আসে; এদের গুঞ্জনে মানুষ জেগে ওঠে, ব্যস্তও হতে থাকে পরিবেশ; তবুও আজহারের 'ঘুমের ঘোর' টুটে না, আর যখন টুটে তখন তার শরীরের ক্লন্তির অবসান ঘটে না, থেকে যায় বুকভরা বেদনার জ্বালা, 'আগুনের তরঙ্গ' যেন। 'আগ্নেয়গিরির বুক থেকে' আগুনের তরঙ্গগুলি 'নির্গম' হলেই আজহার বিছানা ছাড়ে, তারপর শাদা খাতায় কালো দাগ কাটে, লিখে চলে পরীর কথা– প্রেমের কাহিনী, মোহ আর কামনার ইতিবৃত্ত– 'মিলন আর পাওয়ার এবড়ো-থেবড়ো' কথাগুলি। হঠাৎ সবকিছু উলটোপালটো হয়ে যায়, ঘুলিয়ে পড়ে, এ যেন ঠিক 'ঘুমের ঘোরে হাজার রকমের স্বপ্ন' দেখার মত। একদিন আজহার তার এক বন্ধুর কাছে পরীর বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে। তারপর তার জীবন থেকে পরী সরে যায়; তার বিয়ে হয়, দৃষ্টি বিনিময় করে, তারপর সম্প্রদানের পর সে নতুন সংসার পাতে। আজহার ছুটে যায় পরীর কাছে। পরী একটু সময়ের জন্য শুধু স্থির হয়ে দাঁড়ায়, তারপর কিছু না বলেই চলে যায়, ইশারায় যেন বিদায়, তবুও সে আজহারকে ঠিকই ভালোবাসে, তারপরও আজাহরের তৃপ্তির জন্য পরী সরে দাঁড়ায়। আসলে আজহারের চিন্তা করা থেকে পরী নিজেকে জোর করেই সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু সে সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না। তাই হয়ত তার স্বামী বলে, 'তোমার বেদনা তো আমি জানি পরী! তোমার এ বুকজোড়া বেদনা কি দিয়ে আরাম ক'রতে পারব বল?' পরী চমকে ওঠে, বলে, '[...] সব জানেন?' স্বামী বলে, 'আজহার আমার অনেক দিনের বন্ধু। [...] বীর সে, দেশের কাজে গিয়েছে, তাকে আর ডেকো না। মনে কর, যা হয়ে গেছে, তা শুধু ঘুমের ঘোরে।' 'ঘুমের ঘোরে' গল্পটিতে

[৩৪] 'হেনা', কাজী নজরুল ইসলাম।

'কুসুমাদপি কোমল' সুরের সন্ধান পাওয়া যায়, এরসঙ্গে প্রেম ও সংঘাতের দ্বন্দ্বও। নায়ক নারীপ্রেমের বন্ধনের চাইতে দেশ ও জীবনের মুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছে, তাই প্রেমিক-প্রেমিকার দৈহিক মিলনকে ঘৃণা করে, বন্ধুর হাতে নিজের প্রেমিকাকে তুলে দিয়ে সে নিজেকে স্বদেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধযাত্রা করে। এগল্পেও ঘটনা-সমাবেশ, চরিত্র-চিত্রণ ও আঙ্গিকের বৈচিত্র লক্ষণীয়।

'অতৃপ্ত কামনা': একটি ব্যর্থপ্রেমের কাহিনী। নায়ক তরুণ। সে তার হৃদয় 'মাতানো' স্মৃতি রোমন্থন করে; আবার সে-স্মৃতি বারবার মাঝিহীন 'ডিঙ্গি'র মত তার হৃদয়-নদীতে ভেসে ওঠে। নায়ক শুরু করে তার ছেলেবেলার অনেক আগের সেই দিনগুলির কথা দিয়ে; তারপর শুরু হয় ছেলেবেলার কথা– নায়কের হাত দুটি যখন 'ভয়ানক নিশ্-পিশ্' করত কারও পিঠে তাপ্পর লাগানোর জন্য তখনই সে ছুটে যেত নায়িকার (মোতির) কাছে; কিন্তু একদিন সে মোতিকে না-মারার প্রতিজ্ঞা করে, এবং বই থেকে ছবি ছিঁড়ে মোতিকে উপহার দেয়। বইর পাতা ছেঁড়ার জন্য তাকে সারাদিন কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সময় চলতে থাকে। জীবনস্রোতের তরঙ্গও থামে না। হঠাৎ মোতির বিয়ের আলাপ আসে মস্তবড় এক জমিদারের বাড়ি থেকে। ছেলেটি বি. এ. পাশ। নায়ক চায় মোতির এ-ঘরেই বিয়ে হোক, কিন্তু নায়িকা তা চায় না। মোতি ও নায়কের দেখা হয়। নায়ক মিথ্যা শান্তনা দিয়ে তাকে বোঝাতে চায়। মোতি দুচোখ ঢেকে কালবৈশাখীর মত উন্মাদ বেগে ছুটে চলে যায়। নায়কের মনে একটি গোপন ব্যথা, সে-কথা মতি বুঝে না। নায়ক যাকে ভালবেসে ছিল তাকে ব্যথা দিতে গিয়ে সে-ই নিজে বেদনার্ত হয়। বেদনার কাঁটায় সে ছিন্নভিন্ন হয়। ঝাঁঝ্রা হয়। তা যদি জানত মোতি!

'রাজবন্দীর চিঠি': একটি ব্যর্থপ্রেম কাহিনী। প্রেসিডেন্সী জেলে রণক্ষেত্রের স্থান। নায়ক জেলে থেকে তার প্রিয়তমা মানসীর কাছে চিঠি লিখে বলে যে, তার বিদায় নেওয়ার দিন এসেছে। সকলের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পালাও শেষ হয়, কিন্তু বাকি রয়ে যায় মানসী। নায়ক চায় না মানসীকে আর ব্যথা দিতে, কিন্তু তা হয়ে ওঠে না, কারণ তাকে যে কিছুই বলা হয়নি, মানসীরও প্রাণের কথা তার জানা হয়নি, তাই নায়কের বুকজুড়ে না-বলা কথার ব্যথা আস্তানা গেড়ে আছে। চিঠিই তার একমাত্র প্রকাশ করার পন্থা। চিঠিতে নায়ক তার অসহায় অভিমান ও লাঞ্ছিত ভালোবাসার কথা প্রকাশ করে, 'তোমাদের নারী জাতিকে আমি খুব বেশী শ্রদ্ধা করি, প্রাণ হ'তে তাদের মঙ্গল কামানা করি, কিন্তু ওদের ওপর আমার এই অভিযোগ চিরদিন র'য়ে গেল যে, তারা পুরুষের ভালবাসার বড় অনাদর করে, বড় অবহেলা অপমান করে!' এ-গল্পে একদিকে যেমন পাওয়া যায় গভীর ভালোবাসার ইঙ্গিত, তেমনি নারীজাতির প্রতি কটাক্ষও; এরসঙ্গে উপলব্ধি করা যায় নারীপ্রীতি ও নারীবিদ্বেষও বটে!

রিক্তের বেদন

'রণকোলাহলের মত্ততার মাঝে জন্মেছিল তরুণ কবির ভাবরাজ্যের দ্যোতনা-ভরা এই উচ্ছ্বাস। মেসোপটেমিয়ার ধুলি ঝেড়ে আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকেই একে কোল দিতে হয়েছিল। আমার অযোগ্যতাই এতদিন কবির হৃদয়োচ্ছ্বাসকে চেপে রেখে সহৃদয় পাঠকবর্গের সহিত তার পরিচয়ের ব্যাঘাত জন্মিয়েছে। এতে কবি এবং তাঁর পাঠকবর্গের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের জন্য আমি দায়ী। অদ্য প্রায়শ্চিত্ত করলাম।' – কবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক।

'রিক্তের বেদন'[৩৫] গল্প-সংকলটির গল্পের সংখ্যা আটটি: 'রিক্তের বেদন'[৩৬], 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'[৩৭], 'মেহের নেগার'[৩৮], 'সাঁঝের তারা'[৩৯], 'রাক্ষসী'[৪০], 'সালেক'[৪১], 'স্বামীহারা'[৪২] ও 'দুরন্ত পথিক'[৪৩]।

'রিক্তের বেদন': একটি ট্র্যাজেডির গল্প। একটি গদ্যকাব্যও বটে, বিশেষ করে, চরিত্রের দিক থেকে। কাহিনীটি উত্তমপুরুষে বর্ণিত। মূলকাহিনী: নায়ক বীরভূম ছেড়ে সুদূর মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে যুদ্ধে যেতে চায়। তার মা তাকে বাধা দিলে সে বলে, 'মা! মা! কেন বাধা দিচ্ছ?' তারপর যোগ করে, 'গরীয়সী মহিমান্বিত মা আমার! ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও।' সে তার মাকে অনুরোধ করে বলে যে, সে ত জন্মপাগল ছেলে। তাই তাকে না-ছেড়ে উপায় নেই। তার প্রিয়তমা শহিদার ভালবাসাও তাকে যুদ্ধের আহ্বান থেকে সরিয়ে রাখতে পারে না। তার বিদায়ের সময় তার প্রিয়তমা শহিদা শুধু 'রক্তভরা আঁখিতে ব্যাকুল বেদনায়' তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করতে পারে না। রীতিমত অন্তঃদ্বন্দ্বযুদ্ধ শেষ করে নায়ক ওঠে রেলগাড়িতে, আর অমনি 'উন্মাদ' বাষ্পরথটি ছুটে চলে একরোখার মত, ছুটে চলে লাহরের অদূর দিয়ে। একসময় সে পৌঁছে কুর্দ্দিস্তানে, যেখানে 'ডালিম' ফুলের মত রাঙা-সুন্দর 'টুকটুক'-এ একটি বেদুইন যুবতীর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। যুবতীটি তাকে প্রস্তাব করে বিয়ে করার জন্য। নায়ক তাকে ভালোবাসতে পারে না, কারণ সে জানে এই 'বালি-ভরা নীরস' সাহারায় ভালোবাসা থাকতে পারে না; তাই সে ছুটে চলে কারবালায়, আজিজিয়া, কুতল-আমরা, সবশেষে করাচিতে। কারবালায় যখন সে তখন তার দেখা হয় 'গুল'-এর সঙ্গে, সেও নায়কের ভালোবাসা পেতে চায়, কিন্তু নায়ক তাকেও ভালোবাসতে পারে না। এরইমধ্যে শহিদার এক চিঠি আসে। নায়ক জানতে পারে তার বিয়ে হয়ে গেছে, তাই সে শহিদার বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। মরুভূমির গুলও বন্দুক চুরি করতে গিয়ে নায়কের হাতেই সে প্রাণ হারায়, ফলে আরেকটি অসন্ন বন্ধন থেকেও নায়ক চিরমুক্তি পেয়ে যায়। নজরুল গল্পটির মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে, প্রেম প্রেমিকের জীবনে অপরিহার্য, তাই ত নায়ক করাচির ম্লানমৌন আরব-সাগরের 'বিজন বোয়' বসে প্রশ্ন করে, 'আমি আজ কাঙ্গাল না রাজাধিরাজ?' গল্পটিতে নজরুল তাঁর জননী-জন্মভূমির মঙ্গলের কথাই বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করেছেন। দেশের মঙ্গলের জন্যে নজরুলের প্রাণ যে কী-রকম চঞ্চল ছিল তা নায়কের মুখ-দিয়েই প্রকাশ করতে বলেছেন, 'জননী জন্মভূমির মঙ্গলের জন্য যেকোনও অদেখা-দেশের আগুনে প্রাণ আহুতি দিতে একি অগাধ-অসীম উৎসাহ নিয়ে ছুটেছে তরুণ বাঙালীরা– আমার ভাইরা!' স্বদেশের ঋণ শোধ করার জন্য, যুদ্ধের সঙ্গে মাতৃভক্তি মিলে একটি নতুন আদর্শ সৃষ্টি হয়েছে এ-গল্পটিতে, এই অপূর্ব রূপকে প্রকাশ করতে নজরুল নায়কের মাধ্যমে বলেছেন, 'আচ্ছা

[৩৫] টীকা: প্রথম প্রকাশ: (সরকারী নথি মুতাবেক) ১২ই জানুয়ারী ১৯২৫। পৃষ্ঠা– ১+১+১৫৯। মূল্য– দেড় টাকা। প্রকাশক– ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড; ২৬/৯/১-এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
[৩৬] পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ: 'নূর', বৈশাখ ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।
[৩৭] পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ: 'সওগাত', জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ বঙ্গাব্দ।
[৩৮] পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ: 'নূর', মাঘ ১৩২৬ বঙ্গাব্দ।
[৩৯] পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ: 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', মাঘ ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।
[৪০] পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ: 'সওগাত', মাঘ ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।
[৪১] পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ: 'বকুল', আষাঢ় ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।
[৪২] পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ: 'সওগাত', ভাদ্র ১৩২৬ বঙ্গাব্দ।
[৪৩] পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ: 'নবযুগ', আশ্বিন ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।

মা! তুমি বি-এ পাশকরা ছেলের জননী হ'তে চাও, না বীর-মাতা হতে চাও? নিঝুম ঘুমের-আলস্যের দেশে বীরমাতা হবার মত সৌভাগ্যবতী জননী কয়জন আছেন মা?'

'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী': নজরুলের প্রথম প্রকাশিত রচনা (১৯১৯); 'সওগাত'-এর সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন বলেছেন, 'মুসলমান সমাজের কোনো লেখক তখন ঐরূপ ভাষায় ঐ ধরণের কিছু লিখতেন না, বা লিখতে পারতেন না।'[৪৪] 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'র নায়ক এক 'বওয়াটে যুবক', তার জীবনকথাই গল্পের মূলকাহিনী। রসহীন, বৈচিত্র্যহীন একটি গল্প। নজরুলের ছেলেবেলার স্মৃতিনির্ভর জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এতে প্রকাশিত হয়েছে। এ-গল্পে নজরুল কথ্যভঙ্গীর আশ্রয় নিয়েছেন, এবং চলতি রীতি ব্যবহার করেছেন। কাহিনীর শুরু লঘু ও হালকা মেজাজের, তবে পরিণতি অংশটি সংযত। সংলাপ বিরলতায় ভরপুর, করুণরসের আতিশয্য, চরিত্র সৃষ্টিতে অপটু, অতি নাটকীয় বটেই। মূলকাহিনী: ছেলেবেলায় নায়ক ছিল এক দুরন্ত কিশোর। ঘটনাচক্রে সে তার মার 'কক্ষচ্যুত্য' হয়ে সংসারের কর্মবহুল 'ফুটপাতে চিৎপাত' হয়ে নিপাত হয়। কত শত কর্মব্যস্ত 'সবুট-ঠ্যাং' তার 'ব্যথিত পাঁজরের উপর' দিয়ে চলে যায় তার কী কোনও হিশেব আছে। একদিন পাঠশালায় বসে, ছেলেদের মজলিস সরগরম করতে 'বঙ্কিমবাবুর গুড়ের অনুকরণে' আবৃত্তি করে 'মানময়ী রাধে! একবার বদন তোলে গুড়ুক খাও!' তারপর নায়ককে তার বাবা বর্ধমানের 'নিউ স্কুলে' ভর্তি করে দেন। শহরে এসেই নায়ক শহুরি 'বওয়াটে' ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করে। ক্রমে, সে 'বওয়াটে' ছেলেদের ওস্তাদ হয়। তারপর 'পক্ষীরাজ ঘোড়ার' মত ক্লাশের-পর-ক্লাশ ডিঙিয়ে যায়। উনিশের কাছাকাছি যখন তার বয়স তখন সে বিয়ে করে। কিশোরী স্ত্রীকে সে একটু-একটু করে ভালোবাসতে শুরু করে। কিন্তু পরীক্ষার জন্য তাকে বাড়ি ছাড়তে হয়। স্ত্রীও চলে যায় তার পিত্রালয়ে, এখানেই সে দু-মাস পর চিরজন্মের জন্য বিদায় নেয়। সংবাদটি পাওয়া শোনামাত্র নায়ক তার শ্বশুর-বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। তাকে দেখে তার শ্বশুর ও শাশুড়ির অন্তরে তাদের পুরোনো শোকটিকে আবার নতূন করে জাগিয়ে তুলেন। তারপর নায়ক তার স্ত্রীর কবরের মাটির গন্ধ নিয়ে ছুটে আসে বর্ধমানে, এখানেই তার নীরস দিনগুলি কাটতে থাকে। নায়ক আবার বিয়ে করে, সখিনা বধূরূপে তার ঘরে আসে, তবে সে তার প্রথম স্ত্রীকে ভুলতে পারে না। স্বামীর অবহেলায় দিন কাটতে থাকে সখিনার। সে কেঁদে মাটি ভিজিয়ে দিলেও নায়কের মন ভিজে না। নায়ক তার স্ত্রীর অনুশোচনা ও বাক্যজ্বালার যন্ত্রণা এড়োতে না-পেরে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে রাণীগঞ্জে, তারপর সে পরীক্ষা দেয় তবে পাশ করতে পারে না, আবার চলে আসে বর্ধমানে। সময় কাটতে থাকে হট্টগোলের মাঝেই। কিছুদিন পর, খবর পায় সখিনাও 'অজানার রাজ্যে চলে' গেছে, কিন্তু মরার সময় সে নায়কের 'চরণধুলো' পাওয়ার জন্যে কেঁদেছিল, এবং স্বামীর পুরোনো একটি ছবি তার বুকে সযত্নে ধরে রেখে মরেছিল। একসময়, তার মাও চলে যান 'অজানার রাজ্যে', তাই তার 'রাস্তা' পরিষ্কার হয়ে যায়। তারপর শুধু অস্থিরতাই, আর এই অস্থিরতা থেকে নিজেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সে আশ্রয় নেয় রণভূমিতে। অবশেষে, যুদ্ধক্ষেত্রেই সে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করে।

'মেহের-নেগার': করুণ কাহিনী। গল্পের নায়ক য়ুসোফ। সে এক অপরিচিত তরুণীর মাঝে তার ফেলে আসা প্রিয়তমাকে খুঁজে পেতে চায়। একদিন (ভোর), ঝিলম নদীতে স্নান শেষ করে নায়িকা যখন জল উঠে এল তখন তার জলেভেজা কালো চুলগুলি আর ফিরোজা রঙের পাতলা উড়ুনিটি ব্যাকুল আবেগে তার দেহলতাতে জড়িয়ে ধরে। 'আকুল কেশের মাঝে' তার 'সদ্যস্নাত' সুন্দর মুখটি দীঘির কালো জলে ফুটে থাকা পদ্মফুলের মত দেখাচ্ছিল। য়ুসোফ এই মেয়েটিকে দেখে ডাক দেয়, 'মেহের-নেগার' বলে; কিন্তু নায়িকা উত্তরে জানিয়ে দেয়, সে 'মেহের-নেগার' নয়, 'গুল্‌শন'। কিন্তু য়ুসোফ তাকে 'মেহের-নেগার' বলেই ডাকবে বলে জানায়। গুল্‌শন জানতে চায়, য়ুসোফ কী 'মেহের-নেগার'কে এর আগে অন্যকোনও স্থানে দেখেছিল? উত্তরে য়ুসোফ বলে, 'খোওয়াবে!' গুল্‌শন 'ঝরঝর' করে হেসে ওঠে। তারপর বলে, 'আচ্ছা, তুমি কবি না চিত্রকর?' য়ুসোফ বলে, 'চিত্র ভালবাসি, তবে চিত্রকর নই। আমি কবিতাও লিখি কিন্তু কবি নই।' এভাবেই শুরু হয় তাদের সুরবাহারে সুর বাঁধা,

[৪৪] 'সওগাত ও নজরুল ইসলাম', সওগাত, বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য ১৩৮১।

সোহাগভরা ছোঁয়ার আভাস, বাঁধা হয় সরল বাঁশিতে সহজ সুর যেন। তাদের ভালোবাসা গভীর হতে থাকে, এরসঙ্গে সমস্যাও; শুরু হয় গুল্‌শনের হৃদয়ে ছটফট, সে একদিন বলে, '[...] পবিত্র জিনিসের পূজা পবিত্র জিনিস দিয়েই করতে হয়। [...] এই যে তোমার ভালোবাসা,– হোক না তা' মাদকতা আর উন্মাদনার তীব্রতায় ভরা– তা অকৃত্রিম আর প্রগাঢ় পবিত্র! তাকে অবমাননা করতে আমার যে একবিন্দু সামর্থ্য নেই!' গুল্‌শন তার আসল পরিচয় য়ুসোফকে জানিয়ে দেয়, সে 'রূপজীবিনী' বাঈজী খুরশেদজানের মেয়ে, তাই সে ঘৃণ্য, সে অপবিত্রও। য়ুসোফের এতে আপত্তি না-থাকলেও, গুল্‌শন তার জন্মসংক্রান্ত লজ্জায় ও সংস্কারবশত কারণে য়ুসোফের সামনে ধরা দিতে চায় না। তার রক্ত রক্তবর্ণ নয়, বিষ-জর্জ্জরিত মুমূর্ষুর মত নীল। যদিও গুল্‌শনের বুক ভেঙে যায় তবুও য়ুসোফকে পাওয়ার আশা জোর করে সে ত্যাগ করে, তাই সে বিদায় নেয় য়ুসোফের জীবন থেকে। তারপর 'মেহের-নেগার'কে না-পাওয়ায় য়ুসোফ যুদ্ধে চলে যায়। 'মেহের-নেগার' গল্পটির মাধ্যমে নজরুল তাঁর সমাজের স্ববিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে ব্যথিত কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন। একজন বাঈজী-মেয়ের জন্মের জন্য সে ত দায়ী ছিল না, দায়ী ছিল সমাজ ও সমাজের শাসকরূপী মনোভাব। প্রেম ত পবিত্র, তাই নজরুল তাঁর নায়িকার কণ্ঠে প্রকাশ করেছেন, 'অপবিত্র জঠরে জন্ম নিলেও, ওগো পথিক, আমায় ঘৃণা করো না। [...] আমি অপবিত্র কিনা জানি না, কিন্তু পবিত্র ভালোবাসা আমার এই বুকে তার পরশ দিয়েছিল।'

'সাঁঝের তারা': এক উদাসীন দুরন্ত পথিকের প্রেমের পাঁচালি। সাঁঝের তারার সঙ্গে নতুন করে চেনাশোনা, অলস-আঁখির উদাস চাহনি, 'সাঁঝের রাণীর কালো ময়ূরপঙ্খী ডিঙিখানা ধূলি-মলিন পাল উড়িয়ে সাগর বুকে' ধাবিত হওয়া আর অবুঝ মনে ঘুমিয়ে পড়া অবস্থায় পরশমণির ছোঁয়া পাওয়ার আকুলতায় প্রিমতমাকে স্বপ্নে দেখা– এক কথায় প্রেম, স্বপ্ন, রিক্ততা ও শূন্যতার হাহাকার শোনা যায় গল্পটির পরতে পরতে।

'রাক্ষসী': এক নির্যাতিত, নিপীড়িত, হতভাগী নারীর করুণ কাহিনী। মূলকাহিনী: বিন্দি তার কাহিনী বলে যায় মাখনদির কাছে। স্বামী-সন্তান নিয়ে বিন্দির এক সুখের সংসার ছিল, দিনের শেষে সে তিন সের চাল ও তরকারির জন্যে মাছ জোগাড় করে; তার ছেলেও দু-পয়সা রুজি করে; তার মেয়েও শাক, মাছ সংগ্রহ করে; তার 'সোয়ামী'ও বছর শেষে চাষাবাদ ও কৃষাণ করে ধানচাল আনে। এভাবেই সে মোটামোটি খেয়েপরে ভালোই ছিল; কিন্তু পাড়ার এক নষ্ট মেয়েমানুষের প্ররোচনায় তার স্বামীর মধ্যে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। বিন্দির স্বামী তাকে আর সহ্য করতে পারে না, অন্য-নারীতে প্রণয়াসক্ত হওয়াতে। বিন্দি যখন প্রথম একথা জানতে পারে, তখন তার মন কেমন করে যেন ওঠে, মাথায় বাজ পড়ার মত। ক্রমশ তার স্বামী বাড়াবাড়ি শুরু করলে সে তাকে বোঝাতে থাকে, কিন্তু এত করে বোঝানোর পরও তার স্বামী বুঝতে চায় না। বিন্দির স্বামীর, ছুঁড়ির যাদুতে, রীতিমত ভীমরতিই ধরে। একদিন বিন্দির স্বামী ওকে লাথি মেরে চলে গেলে তার সারা শরীর জ্বলে ওঠে। সে আগুন আরও বেড়ে যায় যখন তার স্বামী তার বাকস ভেঙে, যে দু-পয়সা জামানো ছিল, সব টাকাপয়সা ছিনিয়ে নিয়ে নষ্ট-মেয়েটিকে বিয়ে করবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। বিন্দি বলে, 'আমার ত একটা কর্তব্য আছে।' সে স্বামীকে অপথ থেকে সরিয়ে আনতে চায়। স্বামী যেদিন নষ্ট মেয়েটি বিয়ে করতে যাবে সেদিন বিন্দি দা দিয়ে তার ঘাড় থেকে তার মাথাটি আলাদা করে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে পাটক্ষেতে পৌঁছে চিৎকার করতে থাকে, তারপর 'লাল আর লাল' রক্তের খেলা চলতে থাকে। বিচারে বিন্দির জেল হয় সাত বছরের। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে ফিরে আজে তার গ্রামে। তারপর গ্রামবাসীরা তাকে 'রাক্ষুসী' বলে ডাকতে শুরু করে। নজরুল 'রাক্ষুসী'র মাধ্যমে একটি প্রতিবাদী ও দ্রোহী নারীর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, যা হয়ে উঠেছে একটি অসাধারণ নারীবাদী গল্প।

'সালেক': ফারসি কবি হাফিজের একটি গজলের ভাব অবলম্বনে রচিত। মূলকাহিনী: এক শহরে হঠাৎ একজন অচেনা দরবেশ আবির্ভূত হন। তাকে শহরের জোয়ান-বুড়ো সকলেই একইপথ ঘেঁষাঘেঁষি করে দেখে নেয়। সকলের মুখে একইকথা 'ইনি কে?' দরবেশ এসব কথায় কান দেন না। এই শহরে একজন কাজীও বাস করেন। তিনি দরবেশের কথা শুনে তার আস্তানায় এসে উপস্থিত হন। প্রথম প্রথম দরবেশ তাকে আমল দিতে চাননি, পরে কাজী যখন নাছোড়বান্দা হয়ে উঠেন তখন দরবেশ তাকে একটি শর্ত দেন। কাজীও এতে রাজি হন। তারপর এক

জুম্মাবারে, বাদশাহ উজির-নাজিরসহ মসজিদে উপস্থিত হলে কাজী নিজেই নামাজের ইমামতি করেন। হঠাৎ দু-বোতল মদ তার 'বগলতলা' থেকে সশব্দে বিদীর্ণ হলে বিশ্রী গন্ধে মসজিদ ভরে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে বাদশাহর আদেশে কাজীর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়, সঙ্গে পদ-পদাবীও। একইসঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তিনি যেন আর কোনওদিন কারও সামনে না আসেন। এরপর শুরু হয় কাজীর 'জীবনব্যাপী লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা' আর সুদূর-পারের দরবেশের অনুসন্ধান। 'অতি কষ্টে কাজী সাব যখন তাঁর বাঞ্ছিত পথ বেয়ে দরবেশের আস্তানায় এসে' পৌঁছেন 'তখন একটা শান্ত ঘুমের সোহাগতারা ছোঁয়ার আবেশে আঁখির পাতা জড়িয়ে আসছে', তিনি একটি স্নিগ্ধ সান্ত্বনা পান। অবশেষে, দরবেশ তাকে গ্রহণ করে নেন।

'স্বামীহারা'[৪৫]: করুণ কাহিনী।সওগাতে প্রকাশিত নজরুলের দ্বিতীয় গল্প। কপাল পুড়ার কথাই এতে প্রতিফলিত হয়েছে। সংযত, সংহত ও বিষয় উপযোগী। মূলকাহিনী: দরিদ্র ঘরের একটি মেয়ে 'বেগম'র স্বগতোক্তি। দুর্ভাগিনী বেগম একে একে হারায় তার প্রিয়জনকে, প্রথমে তিনটি ভাইবোন– টুনু, তাহেরা ও আবুল, তারপর তার বাবাও জায়গা করে নেন আবুলের পাশে, মাটির ঘরে চিরদিনের জন্য বসবাস করার উদ্দেশ্যে। বেদনা, অপমান, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে আস্তেধীরে বেগমের মাও অজানা দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন; অবশ্য তিনি চলে যাওয়ার আগে তার একমাত্র জীবিত মেয়েকে তার সইমা'র ছেলের হাতে সম্প্রদান করেন। মা'র শোকের আঘাতে বেগমকে মারাত্মক মুর্চ্ছারোগে গ্রাস করে। সে চায় 'স্বামীর কুলে [...] মাথা রেখে [...] শেষ নিশ্বাসটুকু বাতাসের সঙ্গে' মিশিয়ে দিতে, কিন্তু তা হয়ে ওঠে না, এর আগেই 'কলেরা আর বসন্ত জোট করে রাক্ষসের মত হাঁ করে' সমস্ত গ্রামটিকে গ্রাস করে ফেলে। বাড়িময় একটি ঝড় সৃষ্টি হয়, 'চারিদিক হাহাকার আর জল পড়ার ঝম ঝম শব্দ!' এক মস্তবড় বজ্র যেন বেগমের 'কপাল লক্ষ্য করে' আঘাত হানে। বেগমের স্বামীকে ধরে রাখা যায় না, কলেরার অভিশাপ তাকে বাঁচতে দেয় না। এ-অভিশাপে কবলে পড়ে, গাঁয়ের ভরা বুকে একটি 'খাঁ খাঁ' শূন্যতার রাজত্ব সৃষ্টি করে, কত মা, কত ভাইবোন, কত ছেলেমেয়ে 'অচিন মুল্লুকে উধাও' হয়ে যায়। এই অংশে, নজরুল তাঁর সহানুভূতি ও আন্তরিকতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন পীড়িত বাংলার পল্লী-অঞ্চলের কথাগুলি,

> আমাদের মাটির মা তাঁর এই পাড়াগায়ে চিরদরিদ্র জরাব্যাধি-প্রপীড়িত ছেলেমেয়েগুলির দুঃখে ব্যথিত হয়ে করুণ প্রগাঢ় স্নেহে বিরামদায়িনী জননীর মত মাটির আঁচলে ঢেকে বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখেছে! তাঁর এই মাটির রাজ্যেও দুঃখ-ক্লেশ বা কারুর অত্যাচার আসতে পারে না! এখানে শুধু একটা বিরাট অনন্ত সুপ্ত শান্তি কর্মক্লান্ত মানবের নিঃসাড় নিস্পন্দ সুষুপ্তি! এ একটা ঘুমের দেশ, নিঝুমের রাজ্যি।[৪৬]

স্বামীর অকাল মৃত্যুর জন্যে বেগমকেই তার কুসংস্কার আচ্ছন্ন শ্বশুরবাড়ির লোকগুলি দায়ী করে, ভর্ৎসনা করে। মৃত্যুপথযাত্রী বেগম তখন হয়ে যায় অন্যরকম, একসময় সে বলে, 'মৌলবী সাহেবরা হয়ত খুব চটে আমার 'জানাজা'র নামাজই পড়বেন না, কিন্তু মানুষ আর মৌলবীতে অনেক তফাৎ– শাস্ত্র আর হৃদয়ে অনেকটা তফাৎ।' নজরুল আরেকটি সামাজিক সমস্যা এ-গল্পে উপস্থাপন করেছেন, তিনি 'সই-মা'র কণ্ঠে প্রকাশ করেছেন,

> জাত নিয়ে কি ধুয়ে খাব? আর জাত লোকের গায়ে লেখা থাকে? যার চালচলন শরিফের মত সেই ত আশরাফ। খোদা কিয়ামতের দিনে কখ্খনো এমন বলবেন না যে, তুমি সৈয়দ সাহেব, তোমার পাপ পুণ্যি কি, তোমার নিঘ্ঘাত বেহেশ্ত আর তুমি 'হালগজ্জা' শেখ, অতএব তোমার সব 'সওয়াব' বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে, কাজেই তোমার কপালে ত' জাহান্নাম ধরা বাঁধা। আমি চাই শুধু গুণ, তা সে যে জাতই হোক না কেন।[৪৭]

[৪৫] প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র ১৩২৬; সওগাত, ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা।
[৪৬] 'স্বামীহারা', কাজী নজরুল ইসলাম।
[৪৭] 'স্বামী-হারা', কাজী নজরুল ইসলাম।

বিধবাজীবনের অসহ্যযন্ত্রণার একটি করুণচিত্র অঙ্কিত হয়েছে, 'খোদা যেন মেয়েদের বিধবা করবার আগে মরণ দেন, তা না হলে তাদের বে' হবার আগেই যেন তারা 'গোরে' যায়।'[৪৮] নজরুল শুধু হিন্দুর নয়, শুধু মুসলমানের নয়– উভয় সম্প্রদায়েরই, একথাই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর শব্দ ব্যবহারে, 'দোওয়া করি তুই চির এয়োতি হ।'[৪৯] এখানে 'দোওয়া' ও 'এয়োতি' যথাক্রমে মুসলিম ও হিন্দু পরিবেশ-পালিত শব্দ।

'দুরন্ত পথিক': এ-গল্পে দুরন্ত এক পথিক একটি মুক্ত দেশের 'মানবাত্মার সত্য শাশ্বত পথ' রচনার জন্য উদ্বোধনী বাঁশির সুর বাজিয়ে চলে। মুক্তির অভিযানে বাধা দিতে আসে শৃঙ্খল, কিন্তু শৃঙ্খলকে হত্যা করতেই পথিক ব্রতগ্রহণ করে। পথিককে মারো, ধরো, কিন্তু তাকে বাঁধতে পারা যাবে না; তার ত মৃত্যু নেই। সে বারবার আসবে। মুক্তি ও বন্ধনের সংগ্রামে দুরন্ত পথিক প্রাণ হারালে আবার নতুন পথিক আসবে, সংগ্রাম চলবে যুগ যুগ ধরে। নজরুলের এই ভাবনা সম্বন্ধে ড. অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন, 'তাঁর নিকট সাম্যবাদ একটা দূরবস্থিত আদর্শ, ভাব– একটা দুর্গম অভিযানের শেষ, একটা সংগ্রামের অবসান। [...] এ আদর্শের প্রতি নজরুলের আকর্ষণ ও প্রতিক্রিয়া আবেগ-রঞ্জিত, মোহ-নীল। এ তাঁর যৌবন-স্বপ্নেরই পরিণতি। কিন্তু, গভীর ইতিহাসবোধ অথবা সমাজপ্রবাহের আন্তরিক উপলব্ধি থেকে যে নজরুল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা কোন মতেই বলা যায় না।'

[৪৮] 'স্বামী-হারা', কাজী নজরুল ইসলাম।
[৪৯] 'স্বামী-হারা', কাজী নজরুল ইসলাম।

শিউলিমালা

'শিউলিমালা'[৫০]র মোট গল্প-সংখ্যা চারটি: 'পদ্ম-গোখরো'[৫১]; 'জ্বিনের বাদশা'[৫২]; 'অগ্নি-গিরি'[৫৩] ও 'শিউলিমালা'[৫৪] ।

'পদ্ম-গোখরো': বাংলাসাহিত্যে দোসরহীন একটি কাল্পনিক কাহিনী । মানুষ ও বন্যপ্রাণীর গভীর ভালোবাসার কাহিনী । এরকম কাহিনী পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় পাওয়া গেলেও বাংলা ভাষায় প্রায় অসম্ভব, 'আদরিণী' ও 'মহেশ' গল্পগুলি বাদ দিলে । এ-গল্পে নজরুল সামাজিক, মানবিক বিষয়গুলি প্রকাশ করেছেন । বিষয়বস্তু: এক-জোড়া 'পদ্ম-গোখরো'র প্রতি একটি সন্তানহারা মা'র স্নেহকে কেন্দ্র করে গল্পটি গড়ে উঠেছে । সাপ দুটির সঙ্গে গ্রাম্যবধূ জোহরার পরিচয় আকস্মিক ঘটলে বন্যপ্রাণী দুটিই গল্পের প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠে । সাপ দুটিই গল্পের রসঘন পরিণতিটির মূল কেন্দ্রবিন্দু, আর মাতৃস্নেহরসটি গল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে । একজন সন্তানহারা মা বিকল্পরূপে বুকে টেনে নেয় দুটি সাপ শিশুকে, তারাও জোহরার বুকে আশ্রয় খুঁজে নেয় ও তারই অনুরাগী হয়ে ওঠে । ক্ষণে ক্ষণে করুণা, অভিশাপ, অনুনয়, প্রলোভন ও ভর্ৎসনার বিচিত্র ছবিও অঙ্কিত হয় । জোহরার দুটি যমজ সন্তান আঁতুড় ঘরেই মারা যায়, তাই সে মনে করে যে, সেই দুরন্ত দুটি শিশু অন্যরূপে তার কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছে । নজরুলের গল্পটি অপরিসীম আবেগে, উচ্ছ্বাসে, কল্পনার লীলাখেলায় ভরপুর । বন্যপ্রাণীর প্রতি এক অদ্ভুত সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই নজরুল সূক্ষ্মভাবে ন্যায় ও অন্যায়ের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন । তিনি অন্যায়ের প্রতি খড়্গহস্ত, তাই চুরি যে মহাপাপ সেই অন্যায়ের পরাজয় দেখানোর জন্য সাপ দুটির হাতে জোহরার বাবার মৃত্যু ঘটানো হয়েছে, আর মায়ের মৃত্যু কলেরার গ্রাসে না-ঘটিয়ে উপায় কী! তাছাড়া হিন্দু-বিশ্বাস ও মুসলমান-বিশ্বাস কীভাবে বাঙালি সমাজের অংশ হয়ে ওঠে তার একটি চমৎকার আভাস পাওয়া যায় এ-গল্পে । হিন্দুপুরাণের যক্ষের সঙ্গে জিনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নজরুল লিখেছেন,

> রসুলপুরের মীর সাহেবের অবস্থা দেখিতে দেখিতে ফুলিয়া ফাঁপাইয়া উঠিল । লোকে কানাঘুষা করিতে লাগিল, তাহারা জীনের বা যক্ষের ধন পাইয়াছে । নতুবা এই দুই বৎসরের মধ্যে আলাদীনের প্রদীপ ব্যতীত কেহ এরূপ বিত্ত সঞ্চয় করিতে পারে না ।[৫৫]

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মিলনবন্ধনও এ-গল্পে সুস্পষ্ট, যেমন– একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের মেয়ে নিজেকে সহজেই ভাবতে পেরেছে সে নাগমাতা ও নাগরাজেশ্বরী, তার স্বামী নাগলোকের অধীশ্বর । গল্পের ঘটনা, চরিত্রনির্মাণ, আঙ্গিক, ভাষা, ভাব ও গাম্ভীর্য বিস্ময়করভাবে নিয়ন্ত্রিত; যবনিকা পর্যায়ে নাটকীয় রেশটিও চমৎকার; তাই 'পদ্ম-গোখরো' নজরুলের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প ।

'জ্বিনের বাদশাহ': হাস্যরস ও করুণরস দুটিই উপস্থিত । ফরিদপুর জেলার 'আরিয়েল খাঁ' নদীর ধারের ছোট্ট গ্রাম মোহনপুরের এক গ্রাম্যযুবকের প্রেমের কাহিনীকে ভিত্তি করে গল্পটি ফুটে উঠেছে । নায়ক আল্লা-রাখা । এ-নাম তার মা পুঁথি শুনে, আদর করে রেখেছিলেন । আল্লা-রাখা এক দুঃসাহসী ও দুরন্ত ছেলে । তার কুকীর্তির লীলা গ্রামের লোক হাড়ে হাড়ে বুঝে । তাই তাকে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে ডাকে, যেমন 'ইবলিশের পোলা' (মুসলমানরা), 'অমাবস্যার জম্মিৎ' (কায়েতেরা) ও 'হালার পো' (তার বাবা) । তার অপকর্মগুলি হচ্ছে: বাড়ি ও মাঠের ফল-ফসল নষ্ট করা; অকারণে বলদ ঠ্যাঙানো; দড়ি খুলে গরু ছেড়ে দেওয়া; বলদ দিয়ে বাবার ফসল খাওয়ানো, বুড়োবুড়ির দলে অকারণে হামলা চালানো, নিজের বাড়িতে আগুন লাগানো প্রভৃতি ।

---

[৫০] টীকা: প্রথম প্রকাশ: কার্তিক ১৩৩৮, অক্টোবর ১৯৩১ । প্রকাশক: ডি. এম. লাইব্রেরি; ৬১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা । মুদ্রাকর: শ্রী শশিভূষণ পাল; মেটকাফ প্রেস, ১৫ নয়ান চাঁদ দত্ত স্ট্রীট, কলিকাতা । পৃষ্ঠা সংখ্যা– ১১২ । মূল্য: এক টাকা ।
[৫১] পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ: সাপ্তাহিক 'দুন্দুভি', বৈশাখ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ ।
[৫২] পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ: 'সওগাত', বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ ।
[৫৩] পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ: 'সওগাত'; আষাঢ় ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ ।
[৫৪] পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ: 'সওগাত'; শ্রাবণ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ ।
[৫৫] 'পদ্ম-গোখরো', কাজী নজরুল ইসলাম ।

নায়িকা চানভানু। সে যেন তার মায়েরই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত 'সংস্করণ'। সে আদুরে ও অভিমানী। সে চোখেমুখে কথা বলে, মাঠে ঘাটে ছুটোছুটি করে, মানুষজন তার ভয়ে পালায়। আল্লা-রাখা যখন অবলীলাক্রমে তাদের উঠোনে এসে উপস্থিত হয় তখন সে পাকা-করমচা কাঁচা-লঙ্কা দিয়ে তৃপ্তি ভরে খেতে খেতে বলে, 'কেশরঞ্জন বাবু আইছেন গো, খাড়ুলিডা লইয়া আইও।' এরপরই গ্রামময় আল্লা-রাখার এই নামটি রাষ্ট্র হয়ে যায়, বিশেষ করে মেয়েপুরুষরাই এই নামে ঠাট্টা করা শুরু করে। চানভানুর প্রেমলাভের জন্যে আল্লা-রেখা যেসব কীর্তি শুরু করে সেখানে 'কেশরঞ্জন বাবু'র সাফল্যই বেশি। এসব কর্মকীর্তির কারণেই আল্লা-রেখার প্রতি চানভানু আকর্ষিত হয়। কিন্তু যেদিন পাশের গাঁয়ের এক ছেলের সঙ্গে চানভানুর বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক হয় তখন আল্লা-রাখা 'মরিয়া' হয়ে ওঠে চানভানুকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য। সে 'জ্বিনের বাদশা'র বেশভূষা ধারণ করে চানভানুর মা ও বাবাকে ভৌতিক ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে ভয় দেখাতে শুরু করে, তবুও চানভানুর বিয়ে ঠিক হয়ে যায় ছেরাজ হালদারের ছেলের সঙ্গে। তাই সামাজিকভাবে নায়ক-নায়িকার মিলনের কোনও বাঁধা না থাকলেও তাদের মিলন অসমাপ্তই থেকে যায়। 'জ্বিনের বাদশাহ' গল্পের একটি আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক,

> [...] নারদ আলি নামটা হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য রাখা নয়। নারদ আলি অসহযোগ আন্দোলনের অনেক আগের মানুষ। অসহযোগ আন্দোলন যদ্দিনের, তা ওর হাঁটুর বয়েস। [...] নারদ আলি, শেখ রামচন্দ্র, সীতা বিবি প্রভৃতির নাম এখনো গাঁয়ে দশ-বিশটে পাওয়া যায়। অবশ্য, হনুমানুল্লা, বিষ্ণু হোসেন প্রভৃতি নামও আছে কিনা জানিনে।[৫৬]

এ-গল্পে পূর্ব-বাংলার আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করায় সামাজিক চিত্র ও চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। একমুঠো উদাহরণ:

(১) পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক ভাষা: 'আরে, এরেই কয়– খোদায় দেয় তো জোলায় দেয় না! আল্লা মিয়া ত হুকুমই দিছেন চারডা বিবি আনবার, তা কপালে নাই, ওইবো কোহানথ্যা!'[৫৭]

(২) কৃষিজীবী মুসলমান সামাজের প্রভাব: 'আল্লারে আল্লা! (নাকে কানে হাত দিয়ে) তৌবা আস্তাগফারুল্লা! তৌবা তৌবা! আউজবিল্লা (নাউজবিল্লা নয়!) বিসমিল্লা! আরে আমি বারাইয়া দেহি তালগাছের লাহান একডা বুইর‍্যা মাথায় পগগ বাঁইন্দ্যা খারাইয়া আছে! দশ হাত লম্বা তার দারি! আল্লারে আল্লা! ও জিনের বাদশা আইছিলো আমাগো বারিত!'[৫৮]

(৩) সাধু ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার মিশ্রণ: 'মাজগাঁয়ের ছেরাজ হালদার ইচ্ছা করিয়াছে তার পোলার জন্যে চান ভানুরে নিব। ইহা এখনও মনে মনে ভাবে। খবরদার। খবরদার। খোদাতাল্লার হুকুম হইয়াছে আল্লা-রাখার কাছে বিবাহ দিতে। আর যদি খোদাতাল্লার হুকুম অমান্য করছ তবে শেষে তের ম্যাইয়্যা ছেমরি দুষ্ক ও জ্বালার মধ্যে পরিবে।'[৫৯]

'অগ্নি-গিরি': হাস্যরস ও করুণরস দুটিই উপস্থিত। এ-গল্পের নায়ক ঊনিশের কাছাকছি বয়সের এবং গরিব, নিরীহ, বিনয়ী ও শান্তশিষ্ট মাদ্রাসায় পড়ুয়া একজন ছেলে সবর আকন্দ। তার নাম যেমন সবুর, তেমনি কাজেও। তার আশ্রয় নসীব মিঞার বাড়িতে। পাড়ার ছেলেরা কিন্তু তার বিপরীত; 'অতি মাত্রায় দুরন্ত'। গ্রামের দুষ্টু ছেলেরা প্রতিদিন ফন্দি আঁটে কী করে সবুরকে ক্ষ্যাপানো যায়, ফলে সে দুষ্টু ছেলেদের হয়ে ওঠে ব্যঙ্গবিদ্রূপের পাত্র, সব নির্যাতনই সবুর নীরবে মেনে নেয়।

নায়িকা নুরজাহান। নসীব মিঞার একমাত্র সন্তান। সে সবুরের কাছে লেখাপড়া শিখে। নুরজাহান একদিন সবুরের সঙ্গে জমিদারের হাতি নিয়ে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনায় তার উপর তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। তখনই সে প্রতিজ্ঞা

[৫৬] 'জ্বিনের বাদশাহ', কাজী নজরুল ইসলাম।
[৫৭] 'জ্বিনের বাদশাহ', কাজী নজরুল ইসলাম।
[৫৮] 'জ্বিনের বাদশাহ', কাজী নজরুল ইসলাম।
[৫৯] 'জ্বিনের বাদশাহ', কাজী নজরুল ইসলাম।

করে যে, সে সবুরকে দু-একটি কথা শুনিয়ে দেবে। সে যখন সন্ধ্যায় পড়তে আসে তখন সবুরকে বলে, 'আপনি বেডা না? আপনারে লইয়া ইবলিশা পোলাপান যা তা কইব আর আপনি হুইনা ল্যাজ ওড়াইয়া চইল্যা আইবেন? আল্লায় আপনারে হাত-মুখ দিছে না?' কথাটি শুনে সবুর আকন্দ আঘাত পায়, সঙ্গে সঙ্গে তার চোখমুখে পৌরুষের প্রখরদীপ্তি ফুটে ওঠে, লুপ্ত পৌরুষত্বই যেন প্রকাশিত হয়। সে আর গো-বেচারা থাকতে পারে না। তাই 'গাঙের পার'-এর একটি ঘটনায় সবুর আকস্মিকভাবে ছুরির আঘাতে রুস্তমী দলের আমীরকে আহত করে। সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের বিনিময়ে তার জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। শেষপর্যন্ত আমীরের মৃত্যুরই কারণেই তার সাত বছরের কারদণ্ড হয়। জেলের দরজা যখন ভীষণ শব্দে বন্ধ হয়ে যায় তখনই নুরজাহানের সুখের স্বর্গও চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়, ফলে গল্পের উপসংহারটুকু হয়ে ওঠে করুণ। এ-গল্পেও আঞ্চলিক ভাষা লক্ষণীয়। যেমন, পূর্ব-বাংলার ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা-ব্যবহার, 'ঠিক কইছস বেডি, চল আমরা মক্কায় গিয়াই এ সাতটা বছর কাটাইয়া দিই। এ পাপ-পুরীতে আর থাকতাম না! আর আল্লায় যদি বাঁচাইয়া রাহে, ব্যাডা তালবিল্লিরে কইয়া যাইতাম, হে যেন একডিবার আমাদের দেখা দিয়া আইয়ে।'[৬০] এ-গল্পের ঘটনা, বৈচিত্র্য, চরিত্র-চিত্রণ, গ্রামের বাস্তব ছবি, হাস্যরস– সবকিছুই আকষর্ণীয়।

'শিউলিমালা': একটি প্রেমের উপাখ্যান। রোম্যান্টিক ও বিষাদ। কাহিনীনির্মাণে কোনও জটিলতা নেই, সমস্যাও নয়; সহজ, সরল ও স্বাভাবিক। আঙ্গিক ও রূপকল্পের দিক থেকে প্রায় অনিন্দ্য হলেও গল্পটি যেন শেষ হয়েও হয়নি শেষ। নায়ক-নায়িকা সবসময় রোদনোন্মুখ, স্পর্শভারাতুর। গল্পটির জমিন জুড়ে আছে একটি মন্থর, বিষণ্ন, অনাসিক্ত ভঙ্গি ও গঠন। নায়ক-নায়িকার মিলনে কোনও বাঁধা না থাকলেও নজরুল নায়ককে চিরকুমার করে রেখে দিয়েছেন। প্রেমের ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করেছেন। সম্প্রদায়িকতা এসেছে অন্যভাবে। ধনী তরুণ ব্যারিস্টার আজহার আইনের পেশায় সফল হলেও তার নেশা দুটি– দাবা ও গান। সেসূত্রে হিন্দু তরুণী শিউলির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। একজন অপরজনকে ভালোবাসে, তবে সীমাবদ্ধ। শিউলি ফুলের গন্ধ মাখানো স্মৃতির মধ্যে যেন ঘুরপাক খায়। একটু হাত বাড়ালেই হয়ত আজহার তার প্রিয়া শিউলিকে স্পর্শ করতে পারত, কিন্তু করে না, কারণ তার প্রিয়া যেন শিউলি ফুলের মত, বড়ো মৃদু, বড়ো ভীরু, গলায় পরলে দু'দণ্ডে ঝরে পড়বে।

[৬০] 'অগ্নি-গিরি', কাজী নজরুল ইসলাম।

নজরুলের উপন্যাস

নজরুলের মোট তিনটি উপন্যাস– 'বাঁধন-হারা'[৬১], 'মৃত্যু-ক্ষুধা'[৬২] ও 'কুহেলিকা'[৬৩]। গবেষকরা বলেছেন যে, 'বাঁধন-হারা'র নূরুল হুদা, 'মৃত্যু-ক্ষুধা'র আনসার ও 'কুহেলিকা'র জাহাঙ্গীর আসলে নজরুলেরই প্রতিকৃতি; তাই যথাক্রমে এদের মাধ্যমে মুখর হয়ে উঠেছে নজরুলের রোমান্টিকতা, মানবতাবোধ ও স্বাদেশিকতা; আর নজরুলের চঞ্চলচিত্তের দ্বিধাদ্বন্দ্ব (অভিমান বা মানাভিমান) ও অব্যবস্থিতচিত্ততার একটি বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে তাঁর উপন্যাসগুলিতে। তিনটি উপন্যাসেরই নায়ক-নায়িকদের মধ্যে দেবত্ব আরোপিত হয়নি, বা নজরুল তাদের আদর্শায়িতও করেননি, সকলই রক্তমাংসের মানুষ; মানবত্বই উচ্চকিত হয়েছে। তারা দেশ-কাল-সমাজ-সংসারের অংশ, মানবধর্ম ও মনুষ্যসমাজের সদস্য, তাই তাদের মধ্যে ধরা পড়েছে 'পটভূমিকাজনিত' প্রতিক্রিয়া। তারা প্রেমিক বা প্রেমিকা, তারা জীবনের দাবী অস্বীকার করে না (হোক হৃদয়ের বা দেহেরই), তারা অভিন্ন মানবজাতি।

নজরুল যখন উপন্যাসগুলি রচনা করছিলেন তখন প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে, বিশ্বজুড়ে এক নতুন পরিবর্তনের জোয়ার চলছে; এই জোয়ারের ধাক্কায় ভারতবর্ষও কাঁপছে। কেঁপে ওঠে স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষের অধিবাসী। তারা স্বপ্ন দেখে ব্রিটিশ-শাসনের পতনের সঙ্গে স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্ম; তারা স্বপ্ন দেখে বিদেশী-শাসকের হাত থেকে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শোষণমুক্ত একটি ভূখণ্ডের; তাই শুরু হয় আন্দোলন, বিদ্রোহ। ব্রিটিশ-শাসনের যুগের পতনক্ষণে দাঁড়িয়ে নজরুল সাম্রাজবাদী শোষণ কবিলত একটি ভারতবর্ষের মুক্তিলাভের লক্ষ্যে সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে রচনা করেছিলেন তাঁর ত্রি-উপন্যাসগুলি।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি-বিষয়ে নজরুলের উদ্বেগ, বিপ্লব, চিন্তা ও উদ্যম 'বিদ্রোহী' চেতনা ও সত্তা প্রথমেই অভিব্যক্তি লাভ করে তাঁর উপন্যাসে, বিশেষ করে 'বাঁধন-হারা'-শীর্ষক পত্রোপন্যাসের অন্তর্গত 'সাহসিকা'র পত্রে। নজরুলের বিদ্রোহীচেতনা সম্বন্ধে আবদুল আজীজ আল্-আমান বলেছেন, '[...] 'বাঁধন-হারা'র অন্যতম স্ত্রী-চরিত্র মিস্ সাহসিকার (নামকরণটি লক্ষণীয়) পত্রে যে বিদ্রোহের আভাস সূচিত হয়েছে, পরবর্তীকালে সেই সুরই 'বিদ্রোহী' কবিতার কেন্দ্রীয় শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।'[৬৪] অন্য পণ্ডিতরা আবার বলেছেন যে, তাঁর উপন্যাসগুলি কেবল কবিত্বের আবেগে উতরে গেছে, উপন্যাস হিশেবে সেগুলি তেমন কিছুই নয়। এই বদ্ধমূল ধারণার বিপক্ষ থেকে উপন্যাসগুলির মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। নজরুল স্বভাবতই কবি, যুগস্রষ্টা কবি, তবুও তাঁর অভিজ্ঞতা, অন্বেষণ ও অভিপ্রায় কবিতায় প্রকাশ পায়নি, বরং বিভিন্ন শিল্পরূপে ও মাধ্যমে সেসব প্রকাশ পেয়েছে; তবে স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে, কবিতার ভাবাবেগের আর 'বজ্রাদপি কঠোর' ও 'কুসুমাদপি কোমল' সুরের উপর ভিত্তি করে তাঁর উপন্যাসের জগৎটি রচিত হয়েছে।

[৬১] প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭।
[৬২] প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৩৩৭, এপ্রিল ১৯৩০।
[৬৩] প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৮, জুলাই ১৯৩১।
[৬৪] 'নজরুল রচনা-সম্ভার', কলিকাতা, ১৩৭৭।

বাঁধন-হারা

'[...] 'বাঁধন-হারা' বড় উপভোগ্য তাহাতে বিবাহতত্ত্ব বড় সরস– অবিবাহিত দ্বিগ; বিবাহিত চতুষ্পদ, মাঝখানে মায়ের স্নেহাশ্রুমাখা আদরের চিঠিখানি বেশ। তাহার পর করাচির বর্ণনাটি যৌবন জলতরঙ্গ আছে– উপমাগুলি মন-মাতান। – নারায়ণ, ভাদ্র ১৩২৭।

'[...] কাজী নজরুল ইসলামের সেই অনুপম বাঁধনহারা। নজরুল অরূপ রসের কবি তাহা আমি জানিতাম, এবারকার (ভাদ্র) বাঁধনহারার গোড়ায় তাহাকে পাই বাঘের মত কেমন যেন সুন্দর তবু ভয়ঙ্কর [...] কোয়ার্টার গার্ডের হাবিলদারের ছবিটি আঁকিতে রং কোথাও বেশি পড়ে নাই। তারপর আবার সেই রূপ অপরূপে ভাবের রস। এই রসে নজরুল যেমন ফোটে তেমন আর কোথায়ও নয়।' – নারায়ণ, অগ্রহায়ণ ১৩২৭।

'বাঁধন-হারা। পত্রোপন্যাস। [...] ইহাই নজরুল ইসলাম লিখিত প্রথম উপন্যাস। লেখক কবি, তাই এই গ্রন্থে উপন্যাসত্ব অপেক্ষা কাব্যত্ব বেশী ফুটিয়াছে। উপন্যাসের প্রধান উপাদান চরিত্র-সৃষ্টি যে ইহাতে একেবারে নাই, এমন কথা বলিতে না পারা গেলেও, এ গ্রন্থে লেখকের সে ক্ষমতা খুব পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। [...] লেখার সংযম উপন্যাসের পক্ষে অত্যাবশ্যক, কিন্তু এ গ্রন্থের কবি-লেখক কাব্যের জোয়ারে ভাসিয়া গিয়া অনেক স্থলেই সে সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই। ফলে যতটুকু দরকার তার চেয়েও অনেক বেশী কথা তিনি অনাবশ্যকরূপে বলিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে উপন্যাসের বর্ণনীয় বিষয়ের প্রগাঢ়ত্ব ও সৃষ্ট চরিত্রের তীক্ষ্ণতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থোল্লিখিত মূল গল্পটি কিন্তু করুণ, যেন একটা জীবন-নাট্যের ট্রেজেডি– পড়িতে পড়িতে অশ্রু সংবরণ করা যায় না।' – সওগাত, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।

নজরুলের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'বাঁধন-হারা'। হৃদয়াবেগে বা আবেগের উচ্ছ্বাসে রচিত রোমান্টিক পত্রপোন্যাস। পত্রের সংখ্যা মোট আঠারোটি। ইউরোপীয়-সাহিত্যে এরকম উপন্যাসের উদাহরণ অনেক আছে, তবে বাংলা-সাহিত্যে 'বাঁধন-হারা'ই হচ্ছে প্রথম প্রকৃত পত্রোপন্যাস। মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন, 'একটি অদ্ভুত যোগাযোগ বলতে হবে। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসে কাজী নজরুল ইসলাম থাকতে এলো, আর কার্যত ওখান থেকেই বের হতে যাচ্ছিল 'মোসলেম ভারত' নামক পত্রিকাখানি। ওই বাড়ীতে আফজালুল হক সাহেবের বড় তখত্-পোশখানাই ছিল 'মোসলেম ভারতে'র অবিজ্ঞাপিত সম্পাদকীয় দফতর। নজরুল যেদিন এসেছিল সে রাত্রেই তাকে দিয়ে আফজল সাহেবের ঘরে আমরা গান গাইয়ে ছিলেম [...] 'মোসলেম ভারতে'র কিছু কিছু লেখা প্রেসে চলে গিয়েছিল। পরের মাসেই বের হবে কাগজখানা। আমার সম্মুখে সেই রাত্রেই 'মোসলেম ভারতে' লেখা দেওয়ার বিষয়ে আফজালুল হক সাহেবের সঙ্গে নজরুলের কথাবর্তা হয়ে গেল। [...] এর আগে তার কয়েকটি লেখা অন্যান্য কাগজে ছাপা হয়েছিল। নজরুল বলল সে একখানা পত্রোপন্যাস লেখা শুরু করেছে। তার ক'খানা পত্র সে যে করাচীর সেনানিবাস হতে লিখে এনেছিল, একখানা ফুলস্ক্যাপ ফলিও সাইজের খাতা খুলে আমাদের তা সে দেখিয়েও দিল। আফজালুল হক সাহেব রাজী হলেন যে, পত্রোপন্যাসখানা তিনি তাঁর কাগজে ছাপাবেন।'[৬৫]

করাচির সেনানিবাসে অবস্থান কালে পত্রোপন্যাসটির সূচনা হয়। প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩২৭, এপ্রিল-মে ১৯২০), তারপর একই পত্রিকায় উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। মুজফ্ফর আহ্মদের মতে, 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশের সময় নজরুল এর দুটি নাম প্রস্তাব করেন– একটি 'বাঁধন-হারা' ও অন্যটি 'তাহমিনা'। '[...] 'বাঁধন-হারা' নামটিই পছন্দ হল। নজরুল কেন পুস্তকখানার 'তহমীনা' নাম দিতে চেয়েছিল তা জানিনে, তবে পুস্তকে কোনো মেয়ের নাম 'তহমীনা' আছে বলে মনে পড়ছে না। হয়ত নামটি কল্পনায় ছিল। পরে সে [নজরুল] মত পরিবর্তন করেছিল।'[৬৬]

[৬৫] 'নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা', মুজফ্ফর আহ্মদ, প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৫।
[৬৬] 'নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা', মুজফ্ফর আহ্মদ, প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৫।

'বাঁধন-হারা'র কাহিনীটি প্রেমমূলক। মনের কোঠায় ঘুমিয়ে থাকা প্রেমটি যেন জানালা-পথে গলে-আসা একফালি জ্যোৎস্না। নায়ক নূরুল হুদা করাচির সেনানিবাস থেকে দেশে বন্ধু ও আপনজনকে পত্র লিখে, যার মধ্যে নজরুলের সৈনিক-জীবনের ছাপ লক্ষণীয়, তিনি নিজেই যেন নায়কের মাধ্যমে প্রকাশিত। পত্রগুলিতে চিত্রিত সামরিক জীবনের বাস্তবতা একটি বৈচিত্র্যতা দিয়েছে; এমনকি এখানে প্রকাশ পেয়েছে নজরুলের সেনাবাহিনীতে যোগদানের একটি কৈফিয়ৎও,

> [...] যে সামরিক শিক্ষালাভের সৌভাগ্য বাঙালী এই প্রথম লাভ করচে, তাকে এই রকম নষ্ট হতে দেওয়া কি বিবেকসম্মত? আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সামরিক শিক্ষাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।[৬৭]

সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন লিখেছেন, 'চিরচঞ্চল নজরুল এইসময় একদিন উনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালী পল্টনে নাম লিখিয়ে করাচী পাড়ি দিলেন। পিছনে পড়ে রইলো তাঁর স্কুল, আর ইতি হল তাঁর পড়াশুনার। কেন, কি কারণে তিনি স্বেচ্ছায় এই মৃত্যুর মুখে এগিয়ে গিয়েছিলেন, সে গোপন কথাটি তিনি কাউকে বলেননি। আমরা বহু চেষ্টা করেও তাঁর কাছ থেকে এ কথাটি বার করতে পারিনি। এপ্রসঙ্গ উত্থাপন করলেই তিনি প্রসঙ্গন্তরে চলে গেছেন অতি সুকৌশলে। এর ভেতর কি গূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে, তা কে বলবে?'[৬৮] করাচি থেকে মেসোপটেমিয়ায় যাওয়ার সম্ভাবনায় নজরুলের মনে যে উন্মাদনার সৃষ্টি হয় তাও প্রকাশ পায় 'বাঁধন-হারা'তে,

> [...] 'মোবিলিজোশন অর্ডার' বা যুদ্ধ সজ্জার হুকুম হয়েছে। তাই চারিদিকে 'সাজ সাজ' রব পড়ে গেছে। খুবই শীঘ্রই আরব-সাগর পেরিয়ে মেসোপটেমিয়ার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে গিয়ে, তাই আমার আনন্দ আর ধরচে না।[৬৯]

যখন আশাভঙ্গ হল, তখন নরুল হুদা সেনাবাহিনীর নিয়মকানুন সঠিকভাবে রক্ষা করতে পারেনি বলে তাকে ঠেলে ঢোকানো হল 'সামরিক হাজতে; তারপর 'বিচারে ২৮ দিনের সশ্রম কারাদণ্ড ও গারদখানায় বাস'। এ-উপাখ্যানে সন্ধান পাওয়া যায় মেসোপটেমিয়ায় না যাওয়ার ক্ষোভ, তবে নজরুলের সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার মূলকারণ ছিল ভবিষ্যতে তাঁর দুর্ভেদ্য, মৃত্যুঞ্জয়ী, অবিনাশী সংগ্রামী জীবন তৈরি করা। অন্যত্র নজরুল বলেছেন, '[...] আমরা যখন যুদ্ধে যাই, তখন কে হারবে কে জিতবে এ কথা তলিয়ে দেখিনি। আমাদের যুদ্ধে যাবার পেছনে ছিল চপল তারুণ্য। এই তারুণ্যের বশেই আমরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম।[৭০] সৈনিকের প্রশিক্ষণ লাভ করাই ছিল নজরুলের উদ্দেশ্য। তিনি 'বাঁধন-হারা'তে বলেছেন,

> আগুন, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্র, আঘাত, বেদনা– এই অষ্টধাতু দিয়ে আমার জীবন তৈরী হ'চ্ছে, যা হ'বে দুর্ভেদ্য– মৃত্যুঞ্জয়– অবিনাশী। আমার এ পথ শাশ্বত সত্যের পথ,– বিশ্বমানবের জনম জনম ধরে, চাওয়া পথ।[৭১]

নুরুল হুদা তার বাগদত্তাকে ছেড়ে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। সেনানিবাস থেকে সে বন্ধু রবিয়ল ও মনোয়ার, মনোয়ারের বোন ও রবিয়ুলের স্ত্রী রাবেয়াকে চিঠি লিখে; একইসঙ্গে নূরুলের প্রাক্তন প্রেমিকা মাহবুবা, রবিয়ুলের বোন শোফি, রবিয়ুলের মা ও মাহবুবার মা একে অন্যের মধ্যে পত্রালাপ করেন। উপন্যাসটি কেন রচনা করেছিলেন নজরুল এ-সম্বন্ধে বিভিন্ন চিঠির মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব মত প্রকাশ পেয়েছে; যেমন,

১) 'যদিও আমি গল্প-উসন্যাস লিখে থাকি, কিন্তু আমার এই প্রিয়জনদের চিঠি লেখবার সময় আর কিছুতেই সব কথা বেশ গোছালো করে লিখতে পারিনে। সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। কিন্তু তা যেন আমার

[৬৭] 'বাঁধন-হারা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭।
[৬৮] 'যুগস্রষ্টা নজরুল', খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, ১৯৬৮।
[৬৯] 'বাঁধন-হারা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭।
[৭০] 'রাউজানে নজরুল', ওহীদুল আলম, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০।
[৭১] 'বাঁধন-হারা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭।

কাছে ভাই বেশ মিষ্টি লাগে। এতে কেরদানী করে লেখবার চেয়ে যে আসল প্রাণটুকু– সত্যের সত্য-মিথ্যা ধরা পড়ে যায়।'[৭২]

২) 'আমাদের অনেক ঘরের কথা তোকে জানিয়ে দিলাম এইজন্যে যে, তোর উপন্যাস আর গল্প পড়ার ভয়ানক সখ। আর এটা নিশ্চয় জানিস যে, গল্প-উপন্যাস সব মনগড়া কথা, তাই আমাদের এই সত্যিকারের ঘটনাটা তোকে উপন্যাসের চেয়েও হয়তো বেশী আনন্দ দেবে। এতে লজ্জার কিছুই নেই, আর এরকম করে বলা বা লেখাও মেয়েদের পক্ষে কিছুই কঠিন নয়। মেয়েরা যা একটু লজ্জাশীলা থাকে বিয়ের আগেই, তারপর বিয়ে হয়ে গেলেই তাদের সামনে দিকটার এক হাত ঘোমটা পিছন দিকে দু'হাত ঝুলে পড়ে। তাছাড়া, এ আমাদের ননদ-ভাজের ঘরোয়া গোপন চিঠি। এ ত আর অন্য কেউ দেখতে আসছে না।'[৭৩]

৩) 'তুই আমার এইসব মনস্তত্ত্বর বিশ্লেষণ দেখে আমায় ঔপন্যাসিক ঠাউরাস নে যেন।'[৭৪]

৪) 'আমার লিখতে বসলে কেবলই ইচ্ছা হয় যে হৃদয়ের সমস্ত কথা, যা হয়ত বলতে সঙ্কোচ আসবে, অকপটে লিখে যাই। কিন্তু সবটা পারি কই?'[৭৫]

'বাঁধন-হারা' উপন্যাসটির পত্র-পদ্ধতিতে লক্ষ্য করা যায় দিনপঞ্জীর প্রক্রিয়াটিও; যেমন– 'প্রভাত', 'দুপুর-বেলা', 'বিকেল-বেলা', 'সন্ধ্যা', 'দুপুর রাত্তির', 'নিঝুম রাত্তির', 'নিশীথ রাত্তির' ইত্যাদি। আর এই দিনপঞ্জীর প্রক্রিয়াকে অবলম্বন করে চরিত্রসমূহ তাদের নিজস্ব ও স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের প্রেক্ষণবিন্দুকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। নজরুল এই পত্র-পদ্ধতিকে অত্যন্ত কার্যকর হাতিয়ার হিশেবে ব্যবহার করেছেন বাস্তব ও শৈল্পিক কারণ, ফলে চরিত্রগুলি তাদের অন্তরঙ্গ উচ্চারণে এগিয়ে এসেছে। 'বাঁধন-হারা'র নূরুল হুদার মধ্যে যে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক একধরণের ক্ষোভ ও নৈরাজ্যিক প্রবণতার সৃষ্টি হয়েছে এর প্রমাণ উপন্যাসেই সুস্পষ্ট। সাহসিকাকে লেখা রাবেয়ার চিঠিতেও 'বিদ্রোহী' বিষয়টি স্থান পেয়েছে, নায়ক 'ক্রমেই স্রষ্টার প্রতি বিদ্রোহী'[৭৬] হয়ে উঠেছে। ভাবী রাবেয়াকে লেখা এক চিঠিতে নূরুল উল্লেখ করেছে,

> [...] মানুষকে আঘাত করে হত্যা করেই আমার আনন্দ! আমার এ নিষ্ঠুর পাশবিক দুষমনী মানুষের ওপর নয়, মানুষের স্রষ্টার ওপর! এই সৃষ্টিকর্তা যিনিই হন, তাঁকে আমি কখনই ক্ষমা করতে পারবো না– পারবো না! আমাকে লক্ষ জীবনের জাহান্নামে পুড়িয়েও আমায় কব্জায় আনবার শক্তি ঐ অনন্ত অসীম শক্তিধারীর নেই। তাঁর সূর্য, তাঁর বিশ্ব গ্রাস করবার মত ক্ষুদ্র শক্তি আমারও অন্তরে আছে। আমি তাঁকে ভয় করব কেন?– আপনি আমায় শয়তান বলবেন, আমার এ ঔদ্ধত্য দেখে কানে আঙ্গুল দেবেন জানি,– ওহ, তাই হোক! বিশ্বের সবকিছু মিলে আমায় 'শয়তান পিশাচ' বলে অভিহিত করুক, তবে না আমার খেদ মেটে, একটু সত্যিকার আনন্দ পাই। আঃ। ... যে মানুষের স্রষ্টাকে ভয় করিনে আমি, সেই মানুষকে ভয় করে, আমার অন্তরের সত্যকে গোপন করব কেন?[৭৭]

পত্রের ভাষাও এই পত্রপোন্যাসের একটি অসাধারণ গুণ, যা হয়ে উঠেছে চরিত্রানুগ; 'ইহার ভাষা আশ্চর্যরকম সুন্দর জোরালো ও নূতন। কবিতার ন্যায় গদ্যরচনার উপর যে কবির অসামান্য অনাহত অধিকার আছে, তাহা ইহাতে পূর্ণ প্রকাশিত।'[৭৮] ভাষাটি চরিত্রানুগ হওয়া সম্পর্কে নজরুল সফল। শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা যথেষ্ট স্বাভাবিক ও বুদ্ধিদীপ্ত ঢঙে চিঠিপত্র লিখে চলেছে, যা কখনও হালকা, কখনও গভীর। রাবেয়ার অপেক্ষাকৃত পরিণত মন,

[৭২] 'বাঁধন-হারা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭।
[৭৩] 'বাঁধন-হারা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭।
[৭৪] 'বাঁধন-হারা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭।
[৭৫] 'বাঁধন-হারা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭।
[৭৬] 'বাঁধন-হারা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭।
[৭৭] 'বাঁধন-হারা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭।
[৭৮] সওগাত, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫।

অন্যদের প্রতি অভিভাবিকাসুলভ স্নেহ। শোফি আবেগপ্রবণ, দুরন্ত প্রকৃতির নারী। মাহবুবার ধৈর্য অসাধারণ, পরম দুঃখের সময়ও সে হেসে কষ্টকে উড়িয়ে দেয়। প্রাচীনপন্থী, অল্পশিক্ষিতা, সরল প্রকৃতির রবিয়ুলের ও মাহবুবার মা চিঠির বয়ান সাজান নিজেদের মত,

> [...] আমার হাত কাঁপে তবু নিজেই লিখলাম চিঠিটা। কি করি বাবা, মনে যে বালাই, কিছুতেই মানে না। তা ছাড়া, আমিও মুরুখ্যুর মেয়ে নেই। আমার বাবাজী (আল্লাহ তাঁকে জন্নত নসীব করুন) মৌলবী মৌলানা লোক ছিলেন, তাঁর পায়ের এতটুকু ধূলি পেলে তোরা বত্তিয়ে যেতিস![৭৯]

নূরুল হুদাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনীটি আবর্তিত হয়েছে; একইসঙ্গে নায়কের জীবন ও চরিত্রের দুর্জ্ঞেয়তা প্রতিফলিত হয়েছে। নূরুল হুদা এক অনাত্মীয় পরিবারে আশ্রয় নিয়ে নিজের অন্তরের ক্ষুধা মেটাতে চেয়েছিল; এ-যেন মাহবুবার, এক অনাঘ্রাত নারীর, হৃদয়ের অঞ্জলি গ্রহণের প্রত্যাশা; কিন্তু মাহবুবাকে যখন সে কাছে পেয়ে যায় তখন তার মন অতৃপ্ত হয়ে ওঠে। নূরুল হুদাকে লেখা এক চিঠিতে রাবেয়া লিখে,

> লক্ষ্মীর মত তখন যদি তাকে [মাহবুবাকে] তোমার অঙ্গলক্ষ্মী ক'রে নিতে, তবে বেচারীদের আজ আর এত কষ্ট পেতে হ'ত না।[৮০]

মাহবুবাকে অঙ্গলক্ষ্মী করা তো দূরে থাক, তাকে বর্জন করার উদ্দেশ্যে নূরুল আশ্রয় নেয় সেনাবাহিনীতে। নূরুলের এই খেয়ালি প্রত্যাখ্যান কেবল মাহবুবার হৃদয় নয়, তার গোটা পরিবারটিই ভেঙে পড়ে। মাহবুবার মা'র অবমাননাহত ভঙ্গহৃদয় আর আঘাতটি সহ্য করতে না-পেরে সাত দিনের জ্বরে মাহবুবার পিতা মারা যান। মাহবুবাকে নিয়ে তার মা আশ্রয় নেন গ্রামে, ভাইদের কাছে, রাবেয়াদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে। মামা-বাড়িতে পিতৃহীনা, বিবাহযোগ্য মাহবুবার অবস্থা হয়ে ওঠে অসহনীয়। মাহবুবা লিখে,

> হাঁ, মামার বাড়ীর সকলে যেই জানতে পেরেছে যে আমরা খাসদল নিয়ে তাঁদের বাড়ী 'উড়ে এসে জুড়ে' বসার মত জড় গেদে ব'সেচি, অমনি তাঁদের আদর আপ্যায়ণের তোড় দস্তুর-মত ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে।[৮১]

মেয়েমহলেও মাহবুবাকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে হয়। মেয়েরা বলে, 'মাগো মা, মেয়ে নয় যেন সিঙ্গিচড়া ধিঙ্গি!' তারপর মাহবুবার বিত্তশীল মামারা তার বিয়ে ঠিক করেন এক ধনী জমিদার, বৃদ্ধ দোজবর পাত্রের সঙ্গে। তার মা ভাগ্য ও নূরুলের উপর প্রতিশোধ নিতে যেন প্রবল অভিমান ও অহঙ্কারে, রাবেয়া ও রবিয়ুল জননীর প্রসারিত সাহায্যের হাত অগ্রাহ্য করে, এ বিয়েতে রাজি হন। মাহবুবার মা লিখেন,

> বরের বয়েস একটু বেশী, তা হ'লে আর কি ক'রবো! গরীবের মেয়ের জন্য কোন্ নওয়াবজাদা ব'সে আছে বল? এই মাসেই বিয়ে হ'য়ে যাবে। মাহবুবাও মত দিয়েছে;– এ শুনে তোমরা তো আশ্চর্য্য হ'বেই, আমি নিজেই আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছি। [...] আল্লাহ্ এত দুঃখও লিখেছিল অভাগীর কপালে! আমার বুক ফেটে যাচ্চে বুবু শাহেবা বুক ফেটে যাচ্চে![৮২]

মাহবুবা যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ দেওয়ার মতই সংসার পাতে। মাহবুবা লিখে,

> বাঁচবার সাধ আমার ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু এমন ক'রে জাঁতা-পেষা হ'য়ে মরবার প্রবৃত্তিও নেই আমার। ম'রতেই যদি হয় দিদি তা হ'লে সে-সময় কাছে আমার চাওয়ার ধনকে নাই পাই, অন্তত আমার চার পাশের দুয়ার-জানালাগুলি যেন খোলা থাকে।[৮৩]

---

[৭৯] 'বাঁধন-হারা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭।
[৮০] 'বাঁধন-হারা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭।
[৮১] 'বাঁধন-হারা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭।
[৮২] 'বাঁধন-হারা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭।
[৮৩] 'বাঁধন-হারা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭।

মাহবুবার স্বামী রসিক মানুষ, তার অদ্ভুত মন। প্রথমে মাহবুবাকে শাড়ি গয়না ঐশ্বর্য দিয়ে কেনার চেষ্টা করে, পরে হার মানে। দেখতে দেখতে স্বামীটি পৃথিবী থেকে বিদায়ও নেয়। মাহবুবা তার স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে যায়। অন্যদিকে নূরুল আরেকটি নূতন জগৎ আবিষ্কার করে। সে উপলব্ধি করতে শুরু করে, মাহবুবার জন্যেই তার ভালোবাসা সীমিত নয়, শোফির জন্যও তার হৃদয়ে একটু ভালোবাসার স্থান আছে। নূরুল লিখে,

> শোফিটাকে দেখেছি– মাহবুবার চেয়েও কাছে ক'রে কিন্তু পাতার আড়ালে যে বেদনায় কুঁড়ি ধ'রেছিল– তা আমার এই হাজার মাইল দূরে চ'লে আসার আগে আর চোখে পড়েনি, কিন্তু দূরের এ দৃষ্টিটা হ'য়ে উঠেছে আমার বরে শাপ।[৮৪]

শোফির সঙ্গে নূরুলের বিয়ে হয় না। মনোয়াকে চমৎকার স্বামী হিশেবে পেয়েও শোফি সুখি হয় না। মানসিক রোগে সে মরণের কোলে ঢলে পড়ে, নূরুলকে সে ভুলতে পারে না। মাহবুবাও নুরুলকে ভুলতে পারে না, তাই সে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে মক্কা, মদিনা, বাগদাদ যায়, যেন নূরুলেরই সন্ধান করে, সে জানে এ-অঞ্চলেই নূরুল অবস্থান করছে। নূরুল হুদা তার মনের দুটানা আবেগকে এড়াতে আবার আশ্রয় নেয় ব্যারাকে, প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হলেও আরও তিন বছরের চুক্তি নিয়ে অন্যত্র চলে যায়।

প্রসঙ্গত, এ উপন্যাসে নারীবিষয়ক চেতনার ক্ষেত্রে নজরুলের মনের আধুনিক পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে। নারীরা নিজেদের অবস্থা বা সমস্যা নিয়ে চিন্তা করে, বিশ্লেষণ করে, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করে। অভিজাত ঘরের মেয়েরা ধর্মের কারণে স্কুল-কলেজে যেতে না পারলেও বাড়ির মধ্যে বসেই শিক্ষাগ্রহণ করে। রাবেয়া বড়োলোকের মেয়ে, সে যুগের মানদণ্ডে বেশ শিক্ষিতা। বাবা যত্ন করে মেয়ের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন, নিজ-বাড়িতে একজন ব্রাহ্মশিক্ষয়ত্রীকে দিয়ে; এতে নজরুলের ব্রাহ্মশিক্ষয়ত্রীর দ্বারা নারী-শিক্ষার অগ্রগতির প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ পাওয়া যায়। এই শিক্ষয়ত্রী নিজের প্রাণের টানে রাবেয়া, মাহবুবা ও শোফিকে পড়াশোনা শেখান। ব্রাহ্মশিক্ষয়ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তি প্রকাশের জন্যে মাহবুবার একটি চিঠির মাধ্যমে তিনি বলেছেন, 'আমার পূজনীয়া শিক্ষয়ত্রী ঐ ব্রাহ্মমহিলার কথা মনে পড়লে এখনো একটা বুক-ভরা পবিত্র ভক্তিতে আমার অন্তর মন যেন কানায় কানায় ভরে ওঠে।' নজরুল নারীর উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণকে নারী-নির্যাতনের অংশ হিশেবে গণ্য করেছিলেন। তাঁর এরকম মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে মাহবুবার এক চিঠিতে,

> খোদা-না-খাস্তা একটু ঠোঁট নড়লেই মহাভারত অশুদ্ধ আর কি! [...] আমাদের কর্ণধার মর্দরা কর্ণ ধরে যা করেন তাই করি, যা বলান তাই বলি। আমাদের নিজের ইচ্ছায় করবার বা ভাববার মত কিছুই যেন পয়দা হয়নি দুনিয়ায় এখনো, কারণ আমরা যে খালি রক্ত-মাংসের পিণ্ড।[৮৫]

নারীদের উপর পুরুষের অত্যাচার প্রসঙ্গটি আবারও উল্লেখিত হয়েছে সোফি'র চিঠিতে,

> এই সারমেয় গোষ্ঠীর মত আমাদের দেশের পুরুষদেরও এখন দুটিমাত্র অস্ত্র আছে। সে হ'চ্ছে ষাঁড়-বিনিন্দিত কণ্ঠের গগনভেদী চীৎকার আর মূলা-বিনিন্দিত বড় বড় দন্তের পূর্ণবিকাশ আর খিঁচুনি। তাই আমরা আজো মাত্র দুই জায়গায় বাঙালীর বীরত্বের চরম বিকাশ দেখতে পাই; এক হচ্ছে, যখন এঁরা যাত্রার দলে ভীম সাজেন, আর দুই হচ্ছে,– যখন এঁরা অন্দরমহলে এসে স্ত্রীকে ধুমসুনী দেন।[৮৬]

নারী-নির্যাতন প্রসঙ্গে ধর্মশাস্ত্রকেও কটাক্ষ করতেও নজরুল দ্বিধা করেননি। মাহবুবা লিখে,

> কোন কেতাবে নাকি লেখা আছে, পুরুষের পায়ের নীচে বেহেশ্‌ত, আর সে সব কেতাব ও আইন কানুনের রচিয়তা পুরুষ।[৮৭]

---

[৮৪] 'বাঁধন-হারা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭।
[৮৫] 'বাঁধন-হারা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭।
[৮৬] 'বাঁধন-হারা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭।
[৮৭] 'বাঁধন-হারা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭।

হিন্দু-সমাজের অস্পৃশ্যতা-নামক সংস্কার যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রয়োজনে বর্জন করা অপরিহার্য তা নজরুল প্রকাশ করেছিলেন রাবেয়ার মাধ্যেমে। রাবেয়া লিখে,

> আমরা বড় বড় হিন্দু পরিবারের সঙ্গে মিশেছি, খুব বেশী করেই মিশেছি এবং অনেক হিন্দু মেয়ের সঙ্গে খুব ভাবও হয়েছিল, কিন্তু [...] কোথায় যেন কি ব্যবধান থেকে অনবরত একটা অসোয়াস্তি কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে। আমরা তাঁদের বাড়ী গেলেই, তারা হন বা না হন, আমরাই বেশী সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি– এই বুঝি বা কোথায় কি ছোঁয়া গেল, আর অমনি সেটা অপবিত্র হয়ে গেল। আমরা যেন কুকুর বেড়াল আর কি। তারাও আমাদের বাড়ী এসে পাঁচ ছয় হাত দূরে দূরে পা ফেলে ড্যাং পেড়ে পেড়ে বসেন, পাছে কোথায় কি অখাদ্য কুখাদ্য মাড়ান। [...] আমি জোর করে বলতে পারি, এই ছোঁয়া-ছুঁয়ির উপসর্গটা যদি কেউ হিন্দু-সমাজ থেকে উঠিয়ে দিতে পারেন, তা'হলে হিন্দু-মুসলমানের একদিন মিল হয়ে যাবে।[৮৮]

নজরুল ব্রাহ্ম-ধর্মাদর্শে হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে মিলন দেখতে পান। হিন্দুরা ব্রাহ্মদের মত আচরণসম্পন্ন হয়ে উঠলে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে। রাবেয়া লিখে,

> গোঁড়া হিন্দুরা কেন যে ভাই ব্রাহ্মদের ঠাট্টা করে, আমি বুঝতে পারিনে। [...] আমার পূজনীয়া শিক্ষয়িত্রী ঐ ব্রাহ্মমহিলার কথা মনে পড়লে এখনো একটা বুক-ভরা পবিত্র ভক্তিতে আমার অন্তর মন যেন কানায় কানায় ভরে ওঠে। এত মহিমান্বিতা মাতৃশ্রীমণ্ডিততা যে নারী, এত অনবদ্য পূত শালীনতা ও সংযম বিশিষ্টা যে সমাজের নারী সে ধর্মকে সে সমাজকে আমি সালাম করি।[৮৯]

নারী-চরিত্রের প্রতি বিদ্বেষও নজরুলের লেখায় প্রকাশ পেয়েছে, যা ব্যর্থপ্রেমিকের ক্ষুব্ধ উচ্চারণ বলেই মনে হয়। রাবেয়ার বাল্যবান্ধবী 'সাহসিকা'র পরিচয় রাবেয়ার চেয়ে ব্যতিক্রম; এই প্রতীক নামের মাধ্যমেই সে প্রকাশিত, বিকশিত হয়েছে। সাহসিকা একবার প্রেমের ব্যাপারে আঘাত পেয়ে চিরকুমারী থেকে যায়।

নারী-স্বাধীনতা ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্বন্ধে নজরুল ছিলেন খুবই সচেতন। পুরুষের সঙ্গে নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করার বাসনায় নজরুল অবরোধপ্রথাকে অন্তরায় বলে বিবেচনা করেছিলেন বলেই তাঁর এই উপন্যাসে 'বাই আম্মা' বোরকা সরিয়ে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিতে পেরেছিলেন। নারী-নির্যাতনের বিভিন্ন প্রসঙ্গ এ উপন্যাসে বিচিত্রভাবে প্রতিফলিত হলেও নারীবাদী উচ্চাশা বা আকাঙ্ক্ষার অনুপস্থিত লক্ষণীয়। নজরুলের অবশ্যি দৃঢ়বিশ্বাস, শিক্ষিত নারী-সমাজ গড়ে তুলতে না পারলে দেশের সত্যিকার উন্নতি সম্ভব নয়, অবশ্য অন্য-দেশগুলির নারীর মত ভারতবর্ষের একজন সাধারণ নারী 'মর্দানা লেবাস পরে ঘোড়ার সওয়ার হয়ে বেড়াতে' বা 'হাজার হাজার লোকের' সামনে দাঁড়িয়ে 'গলাবাজি' করতে চায় না, পুরুষের 'গড়া খাঁচা'র মাঝে সে একটু 'সোয়াস্তি'র সঙ্গে বেড়াতে ও চড়তে চায়। সে পুরুষের 'খামখেয়ালি'তে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, যা নিতান্তই অন্যায়, সেগুলি থেকে 'রেহাই' পেতেই চায়, এরসঙ্গে চায় একটু শান্তি; কিন্তু ভারতবর্ষের একজন সাধারণ নারী তা পাওয়ার কথা নয়।

[৮৮] 'বাঁধন-হারা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭।
[৮৯] 'বাঁধন-হারা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭।

মৃত্যু-ক্ষুধা

[...] নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরে একটি ভালো বাড়ী পেয়ে হৈ বাড়ীতে উঠে গেল। বাড়ীটি ছিল স্টেশন রোডের ধারে। একতলা ছোট বাড়ী হলেও খুব চওড়া ছিল তার বারান্দা। পাশে আমের বাগান ছিল এবং এত বেশী খোলা ময়দান ছিল যে তাকে বাগান বাড়ীও বলা যায়। বাড়ীর মালিক ছিলেন একজন খ্রীস্টান মহিলা। নিকটেই ছিল "দত্ত-নিবাস"– বিখ্যাত অধ্যাপক উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্তের বাড়ী। এই জায়গাটা কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত চাঁদ সড়ক ইলাকা। শ্রমজীবী খ্রীস্টান ও মুসলিমদের বাস এই ইলাকায়। নজরুলের উপন্যা "মৃত্যু-ক্ষুধা" এই পরিবেশেই লেখা হয়েছিল। – মুজফ্ফর আহ্মদ, কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা।

মানবিক, আন্তর্জাতিক, সামাজিক বিভেদের মূলকারণই হচ্ছে অর্থনীতি– এর সমস্যা ও আকাঙ্ক্ষার কথা নজরুল নিজের অভিজ্ঞতায় ও কল্পনায় আলোকিত করে, গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে, তাঁর 'মৃত্যু-ক্ষুধা'[৯০] উপন্যাসের পরতে পরতে প্রকাশ করেছেন। নজরুল চমৎকারভাবে এঁকেছেন উপরতলার ও নীচতলার মানসিক পরিবর্তনের একটি সুস্পষ্ট চিত্রও। একইসঙ্গে আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যে ধর্মত্যাগের বিষয়টিও লক্ষণীয়।

'মৃত্যু-ক্ষুধা' একটি উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস। আবদুল আজীজ আল্-আমানের মতে, নজরুল যখন কৃষ্ণনগরে বসবাস করছিলেন তখনই এই উপন্যাসটির রচনা শুরু করেন। অনিয়মিতভাবে 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ থেকে মাঘ ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। 'মৃত্যু-ক্ষুধা'র পটভূমিকা বিশের দশকের শ্রমিক জীবন ও সাম্যবাদী আন্দোলন। এতে মেহনতী মানুষের জীবন চিত্র ও কৃষ্ণনগরের এক বস্তি পাড়ার হতদরিদ্র মানুষের ছবি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। বস্তিবাসীদের দুঃখ, অভাব, কষ্ট, লাঞ্ছনার ছবি যেমনি আছে, তেমনি তাদের বেঁচে থাকার জন্য জীবন-সংগ্রামের ইতিবৃত্তও। এই বস্তিবাসীরা নিজেদের মধ্যে যেমন ঝগড়া করে তেমনি তাদের মধ্যকার ঝগড়াগুলি ভুলতেও সময় নেয় না। এই বস্তি-সমাজের মধ্যেও এক অভাগা পরিবার আছে। এই পরিবারের প্রধান নারী 'গজালের মা'। তার তিনজন উপার্জন-সক্ষম ছেলে মারা গেছে, শুধু রয়ে গেছে তার ছোটছেলে প্যাঁকালে, স্বামী পরিত্যক্তা একমাত্র মেয়ে পাঁচি, পাঁচির 'নাদুস-নুদুস্' একটি ছেলে, তিনটি বিধবা পুত্রবধূ ও এতিম 'এক ডজন' ক্ষুধার্ত নাতি-নাতনী।

প্যাঁকালে সুপুরুষ। রাজমিস্ত্রির কাজ ছাড়াও 'টাউনের থিয়েটার দলে নাচে, সখী সাজে, গান করে'। গলা খুব ভালো। সাজসজ্জা ও কেশ পরিচর্যার দিকেও নজর রাখে। পাড়ার উঠতি মেয়েদের মাঝে তার 'মস্ত নাম'। সেই নাম রক্ষার্থেই সে আয়নার অভাবে থালার জলে মুখ দেখে নেয়; কিন্তু আয়না কেনার বাসনা তার আছে, তাই ত 'রোজই তার রোজের পয়সা থেকে চার আনা আলাদা ক'রে রাখে।' সে পান খায়, চা পান করে। প্যাঁকালে চৌদ্দের কাছাকাছি বয়সের কুর্শি নামের এক খ্রিস্টান কিশোরীর হৃদয় জয় করে নিয়েছে। ক্ষুধার্ত প্যাঁকালের অন্ন না জোটলেও প্রিয়তমার সামনে সে সৌখিন, ফলে সে 'মাঝে মাঝে থিয়েটারের ইয়ার বাবুদের' কাছ থেকে দু-একটি সিগারেট চেয়ে রাখে এবং সেগুলি 'কুর্শির কাছ ছাড়া আর কারুর কাছেই' খায় না।

বিধবা মেজ-বৌ রূপেগুণে অতুলনীয়, সে-ই উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র। সে স্বাধীন, প্রাণচঞ্চল, জীবনোন্মুখ নারী। ধর্মপালনের চেয়ে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষাই তার মন জুড়ে, তাই শাশুড়ির ভয়– এমন রত্ন দরিদ্রঘরে পড়ে থাকবে না, সে তার ধনী ভগ্নীপতি ঘিয়াসুদ্দীনকে নিকে করে চলে যাবে। শাশুড়ি ও ননদ পাঁচি চেষ্টা চালায় মেজ-বৌয়ের সঙ্গে প্যাঁকালের বিয়ে দিতে, এতে আর যাই হোক মেজ-বৌ ঘরে থাকবে, আবার বিধর্মী মেয়ের জন্য প্যাঁকালের দুর্বলতাও কেটে যাবে। এধরণের দেওর-ভাবীর বিয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু

[৯০] 'মৃত্যু-ক্ষুধা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৩৩৬, জানুয়ারী ১৯৩০।

প্যাঁকালে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, 'আমি তা কখনও পারব না ।' অন্যদিকে কুর্শি যখন মেজ-বৌকে নিকে করা নিয়ে প্রশ্ন করে তখন প্যাঁকালে বলে, 'আল্লার কিরে কুর্শি, খোদার কসম, আমি ও নিকে করছিনে ।'

প্যাঁকালের কাছে দুঃখের চেয়ে সুখপ্রেমভোগ বড় । একদিন সন্ধ্যায় কাজ শেষে প্যাঁকালে যখন সারাদিনের ক্লান্তভরা দেহ নিয়ে বাড়ি ফিরছিল তখন কুর্শির পরপুরুষের সঙ্গে আলাপে লিপ্ত থাকাকে সে সহ্য করতে পারেনি, তাই সে সঙ্গে সঙ্গে একটি কাণ্ড ঘটিয়ে দেয় ।

খ্রিস্টান বা ইহুদি মেয়ে বিয়ে করা মুসলমান পুরুষের বেলায় কোনও বাঁধা নেই, তবে ধর্মের এ উদারব্যাখ্যা কুসংস্কারযুক্ত মুসলমান-সমাজ মেনে নেয় না । অন্যদিকে প্যাঁকালের কাছে ধর্মের চেয়ে বড় হচ্ছে কুর্শি । তাই ত সে কুর্শিকে বিয়ে করে, সংসার পাতে, কিন্তু সুখের জীবনের অন্তরায় যে অভাব তাকে সে ঠেকাতে, সূক্ষ্ম ভাবনাচিন্ত ার ডালপাতালতাকে ছাটাই করার আগেই সম্প্রসারিত অর্থলোভের আমন্ত্রণকে অগ্রাহ্য করতে না-পেরে খ্রিস্টান হয়ে বরিশালে চলে যায় । প্যাঁকালে চলে যাওয়ার পর তার ক্ষুধার্ত ভাইপো ও ভাইঝিরা অন্নের তাড়নায় শ্বাসপ্রশ্বাসটুকু ছাড়া তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না । অন্যদিকে সেজ-বৌ টাইফয়েড থেকে কোনওরকম বেঁচে ওঠে । 'কসাই যেমন ক'রে মাংস থেঁতলায়, রোগ-শোক দুঃখ-দারিদ্র্য এই চারটীতে মিলে তেমনি ক'রে যেন থেঁতলেছে ।' সেজ-বৌয়ের কোলে স্বামীর শেষ অসহায় স্মৃতি দু'মাসের খোকা কাঁদতে থাকে । 'কান্না ত নয়, যেন বেঁচে থাকার প্রতিবাদ ।' সেজ-বৌ ও তার ছেলে যখন একরকম অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে তখন হঠাৎ একদিন 'পাদরী সায়েব আর মেম' তাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হন । পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের কাছাকাছি বয়সের মিস জোন্স সেজ-বৌকে পরীক্ষানিরীক্ষা করে, প্যাঁকালের মাকে ডেকে কতগুলি ওষুধ দেন । এরসঙ্গে সেজ-বৌকে 'বেদানার রস' খাওয়ানোর জন্যে মেজ-বৌকে ডেকে একটি টাকাও দেন । শেষপর্যন্ত, অবশ্য সেজ-বৌ ও তার খোকাকে বাঁচানো যায়নি । এরইমধ্যে মেজ-বৌয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণশক্তিগুণে মিস জোন্স তার প্রতি আকৃষ্ট হন । তারপর তার কাছে যাওয়া-আসা শুরু করে মেজ-বৌ । একদিন মিস্ জোন্স 'একথা সে-কথা'র পর বললেন, 'ডেখো, টোমার মটো বুদ্ধিমতী মেয়ে লেখাপড়া শিখলে অনেক কাজ করটে পারে । টোমাকে ডেকে এট লোভ হয় লেখাপড়া শেখাবার ।' মেজ-বৌয়েরও সাধ জেগে ওঠে লেখাপড়া শেখার জন্য । মিস জোন্স তাকে পড়াশোনা ও সেলাই-কাজ শেখান । খ্রিস্টান-ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য ছাড়াও তিনি সত্যিই মেজ-বৌকে ভালোবাসেন । নারী পরম্পরার এই শিক্ষার ধারণা বা ধারা লক্ষণীয় । মেজ-বৌয়ের মনে কিছুটা লেখাপড়া ও সেলাই-কাজ শিখে নিজের পায়ে দাঁড়ানো ছাড়া অন্যকোনও উদ্দেশ্য ছিল না । তবে সমাজে এ নিয়ে এতই শোরগোল বেঁধে যায় যে, সে শেষপর্যন্ত ঘর ছেড়ে, তার দুই ছেলেমেয়েকে রেখে, খ্রিস্টান-ধর্ম গ্রহণ করে । অভাবের জন্য মেজ-বৌ খ্রিস্টান হতে বাধ্য হয় । মেজ-বৌয়ের ইচ্ছে শুধু বাঁচার নয়, তার তৃষ্ণা হচ্ছে জীবনের জন্যে ।

নজরুল স্পষ্টভাবেই মেজ-বৌকে খ্রিস্টান বানানিয়ে নিলেন । কারণ, তিনি জানেন বাঙালি জাতির দুঃখের মূল কারণই হচ্ছে তার অর্থনৈতিক অবস্থা । আচার, নীতি, ধর্ম বা সংস্কৃতি মূলসমস্যা নয় । মেজ-বৌ খ্রিস্টান হত-না যদি তার পেটে অন্ন থাকত । মেজ-বৌ স্পষ্টই জানে, ধর্মান্তরিত হলে সে পাপ করবে, অন্যায় করবে, এর ক্ষমা নেই, যার ফল ভীষণ এবং এর জন্য তাকে অনন্তকাল অনুতাপ করতে হবে । সে আরও জানে; তিলে তিলে ধুঁকে মরার চেয়ে খ্রিস্টান-ধর্ম গ্রহণ করা অনেক ভালো । চাঁদ সড়কের বস্তিবাসীদের 'ওমান কাতলি' [রোমান ক্যাথলিক] হয়ে যাওয়ার মধ্য-দিয়ে নজরুল ইংরাজ শাসনামলের অন্যতম অভিশাপকে তুলে ধরেছিলেন । পেটের জ্বালায় গরীব, অসহায়, অভাগা বাঙালিরা খ্রিস্টান-ধর্ম গ্রহণ করত; কারণ, খ্রিস্টান হলে আর যাই হোক-না কেন, অন্ত তপক্ষে, পেট ভরে ত ভাত খেতে পারবে । অন্যদিকে নজরুল স্পষ্টই দেখিয়ে দিয়েছিলেন ধর্ম পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের দুর্ভাগ্যের আংশিক পরিবর্তন হলেও আসলে তার মূল ছিল এক বিকট সামাজিক বৈষম্যের গভীরে ।

মেজ-বৌয়ের প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় কেমন করে তার দুটো ছেলেমেয়েকে নিয়ে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকবে । এ-ব্যাপারে সে যে-কোনওরকম চেষ্টা করতে গেলেই বস্তিবাসী মুসলমানরা হৈচৈ শুরু করে । সমাজপতিরা কখনও সাহায্যের হাত বাড়ায় না, কিন্তু নিন্দা-মন্দ ও ফতোয়া জারি করতে ওস্তাদ । ভাত দেওয়ার কেউ নেই, কিন্তু কিল

মারার গোঁসাইয়ের অভাব নেই যেন। মেজ-বৌয়ের মত নারীর জীবনের পক্ষে রুদ্ধশ্বাস-বায়ুহীন সমাজ থেকে উদ্ধার পাওয়ার প্রয়োজনে খ্রিস্টান-ধর্ম গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় হয়ে ওঠে। বোধহয় এইজন্যে আনসারের কথার উত্তরে মেজ-বৌ বলে, 'আমি তো হঠাৎ খ্রিষ্টান হয়নি। [...] আপনারা একটু একটু করে আমায় খ্রিষ্টান করেছেন।' অর্থাৎ ঘটনাচক্র ও সামাজিক চাপ তাকে এ-দিকে অগ্রসর হতে বাধ্য করেছে। আনসার চিন্তা করে, অন্য অবস্থায় মেজ-বৌয়ের মত যে-কোনও নারী কী না করতে পারত, কী না হতে পারত; তবে মেজ-বৌ কেবল অসহায়, নির্যাতিতা নারী নয়, এক জটিল চরিত্রও বটে; যেন সাপ ও আগুন নিয়ে খেলার মেলা। মুসলমান সমাজে হিন্দুদের মত বৈধবা নিয়ে কড়াকড়ি নেই, তাই সে চুড়ি পরে, পান খায়– এ নিয়ে বস্তি-মহলে কথাও ওঠে। মেজ-বৌ নূতন করে বাঁচার জন্যে মিশনে যোগ দিতে চায়, কিন্তু জুতো মোজা পরা মেম-শাহেবের জীবন তার ভালো লাগে না। দেখতে দেখতে মেজ-বৌ খ্রিস্টান মিশনে যোগ দেয়। সমাজের ঘৃণা এবং চিৎকারের অন্ত থাকে না। প্যাঁকালের মাকে দিয়ে বস্তিবাসীরা বিরাট প্রায়শ্চিত্ত পর্যন্ত করিয়ে নেয়। প্যাঁকালের মা তার ছাগল ক'টা বিক্রি করে পনেরো টাকা যোগাড় করে দেয়; কারণ, এ না করলে সে সমাজে 'পতিত' থাকবে। মেজ-বৌকে দিয়ে নজরুল এক মর্মান্তিক চিত্র এঁকেছেন, এক ভয়াবহ ইঙ্গিত করেছেন; এ যেন সমাজকে উপলক্ষ করে আচার, অনুশান, গোঁড়ামি, কুসংস্কার আর প্রগতিবিমুখতার চিত্রটি সকলের সামনে উন্মুক্ত করেছেন; নিজের বুকের মধ্যে যে মৃত্যুর জীবাণু পুষেন উদাসীনভাবে তারই চিত্র যেন।

মেজ-বৌকে 'বরিশাল বদলি' করা হয়। কুর্শি ও প্যাঁকালের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। ছেলের মৃত্যুর কারণে মেজ-বৌ, কুর্শি ও প্যাঁকালে আবার বস্তিতে ফিরে আসে। এক জঘন্য অন্ধকার পরিবেশের মধ্যে স্থূল, অপরিতৃপ্ত, অসুখী জীবনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে সামজের এক বৃহত্তম শক্তি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে উদ্দেশ্যহীন ভাবে, এরই বাস্তব চিত্রটি ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসের পরতে পরতে। উপরতলার অধিবাসীরা এসব দেখেও না দেখার ভান করে, এ সমাজকে নিয়ে তাদের মাথা ঘামানোর সময় কোথায়! কিন্তু বিশেষ বিশেষ সময়ে এসব উপরতলার মানুষদের বড় করিৎকর্মা দেখা যায়; তারা উৎসাহী হয়ে ওঠে ধর্মের অপকর্মের ব্যাপারেই বেশি, সেখানে তারা পান থেকে চুন খসতে দেখলে চমকে ওঠে, তাদের ইহকাল যেন ধ্বংস হয়ে যায়। খান বাহাদুর শাহেব কুড়ি টাকার একটি চাকরি প্যাঁকালেকে জুটিয়ে দিয়ে আবার তাকে কলমা পড়িয়ে মুসলমান করেন। প্যাঁকালের স্ত্রী কুর্শিও ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করে; কারণ, তার বাবা মধু ঘরামী অনেকদিন আগেই মারা গেছে, কাজেই কুর্শিও 'খানিক কেঁদে-কেটে' শেষপর্যন্ত প্যাঁকালের ধর্মকে গ্রহণ করে। এই কাহিনীটি চিত্রণে নজরুল দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের কাছে যে, দারিদ্র্যতা-মোচনের প্রশ্নটিই মুখ্য, ধর্ম পরিচয় নয়– তাই ফুটিয়ে তুলেছেন। মেজ-বৌকে পাড়ার মোড়ল মুসলমান করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে।

> পাড়ার মোড়ল হিশেবি লোক, অনেক চিন্তার পর স্থির করল যে, পাড়ার কোনও মুসলমান ছোকরাকে দিয়ে ওর রসস্থ মন ভুলাতে পারলে ওকে অনায়াসেই স্বধর্মে ফিরিয়ে এনে একজন নাসারাকে মুসলমান করার গৌরব ও পুণ্যের অধিকারী হ'তে পারবে।[৯১]

ছেলের মৃত্যুর কারণে মেজ-বৌয়ের মনোবল ভেঙে যায়। তবু সে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে ফিরে এল না। বস্তির শিশুদলকে ভালোবেসে নিজের শূন্য বুক ভরে তুলতে চায়। ইতোমধ্যে এই পরিবেশে আসে তরুণ সাম্যবাদী শ্রমিকনেতা আনসার। সে রাজনীতি করে হেয় বস্তিবাসীকে নিয়ে, যারা আর্থিক দিক দিয়ে সর্বহারা, অন্নহারা তাদের নিয়ে। সে জ্ঞান রাখে কার্ল-মার্কস, লেলিন, ট্রটসইক, স্টালিন, কৃষক, শ্রমিক, পরাধীনতা, অর্থনীতি সম্বন্ধে। বস্তিবাসীকে আত্মপরিচয় দানে চেষ্টা করে। সে জানে নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাসী হয়ে, পুরাতনকে ভেঙে নব-সমাজ-পদ্ধতি প্রয়োগ না-করলে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করা অসম্ভব, তাই সে বস্তিবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্যে রাজনীতি করে। আনসারের আসার সঙ্গে সঙ্গেই উপন্যাসের কাহিনীটি অন্যদিকে মোড় নেয়। প্রতীক্ষায় ঋজু পায়ে এগিয়ে চলে। পঙ্গু সমাজ-ব্যবস্থার যে-পরিবর্তন প্রয়োজন সে-পরিবর্তন সর্বহারাদের

[৯১] 'মৃত্যু-ক্ষুধা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৩৩৬, জানুয়ারী ১৯৩০।

হাতে সমাজের ওপর আঘাত হানার মাধ্যমেই সম্ভব; এ-পথ নজরুল বাতিয়ে দেন আনসারের কার্যকলাপ এবং কথার মাধ্যমে। এই আঘাত হানার জন্যে যে স্থায়ী সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন বা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া উচিত তা একমাত্র সম্ভব বিপ্লব-আন্দোলনের মাধ্যমেই, এই মূল্যবান কথাটি নজরুল বলে দিয়েছেন আনসারের মাধ্যমে। আনসার যে একজন সার্থক কর্মী, তার কাজের পদ্ধতির উল্লেখ না থাকলেও তা বোঝা যায় তার জেলে যাওয়ার সময়কার ভিড় দেখে। ম্যাজিস্ট্রেট-নন্দিনী রুবি ও আনসার একে অন্যকে ভালোবাসে। রুবি একজন উচ্চপদস্থ আমলার মেয়ে। রুবির বাবা ও মা তার বিয়ে দেন তেমনি আর-এক আমলার সঙ্গে। অতি সংক্ষিপ্ত বিবাহিত জীবনে রুবি তার স্বামীকে ভালোবাসতে পারেনি। স্বামীও তাকে বিলেত যাত্রার পাথেয় ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেনি। রুবি পড়াশোনা নিয়ে থাকে। তার বাবা ও মা'র উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে সে হিন্দু বিধবার মত কৃচ্ছ্রসাধন করে। যে আনসার রুবির সত্যিকারের সাথী হতে পারত, সেই মানুষটির সঙ্গে তার মনের মিলন ঘটে তার মৃত্যুশয্যায়।

'মৃত্যু-ক্ষুধা'য় বস্তুবাদের উপর জয় হয় ভাববাদের, শুধু তাই নয় পাঠকের চোখে আঙুল দিয়ে নজরুল দেখিয়ে দিয়েছেন, 'আমাকে বস্তুবাদী ব'লে মনে হ'লেও আসলে আমি ভাববাদী'; এ-রচনার গড়নটি উপন্যাসের কিন্তু এর ধ্যান-ধারণা কবি নজরুল ইসলামের। এতে 'সারা পথ তাঁর পায়ের তলায় কাঁদতে থাকে', একইসঙ্গে শোনা যায় নিখিল দুনিয়ার মানুষের আত্মার ক্রন্দনটিও।

কুহেলিকা

'কুহেলিকা'[৯২] নিঃসন্দেহে একটি সমাজ-সচেতন, রাজনীতি-সচেতন ও বিপ্লববাদ-সচেতন উপন্যাস। ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লববাদের কথাই এতে প্রকাশিত হয়েছে। বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকায় 'কুহেলিকা' সম্বন্ধে বলা হয়, 'A story of a rich youth who joins the revolutionary movement, and is eventually arrested and transported for life, and who at the time of his departure for the Andaman gives a portion of his property to his affianced bride and entrusts for the good of the poor, the bulk of his riches to a revolutionary girl whome he has fallen in love.'[93] আবদুল আজীজ আল্-আমানের মতে, এই উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশের পূর্বে মাসিক 'নওরোজ' পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩৩৪) প্রথম থেকে পঞ্চম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। তারপর পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশের পর 'নওরোজ' পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়, ফলে উপন্যাসের আর-কোনও অংশ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি, বাকি অংশগুলি 'সওগাত' পত্রিকায় পৌষ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ থেকে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে নজরুল বিপ্লববাদীদের জীবন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন,

> অদ্ভুত এই বিপ্লববাদীদের জীবন। যাদের নাম ভাবলেই মনে হয়, না জানি ইহারা কত ভীষণ হিংস্র জীব! [...] কিন্তু [...] যাঁহারা বিপ্লবীদের সংস্পর্শে কোনওদিন একমুহূর্ত্তের জন্যও আসিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, ইহা কত বড় মিথ্যা।[৯৪]

বিপ্লবীদের গুণ-কির্ত্তন করতে গিয়ে নজরুল বলেছেন যে, তারা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, স্নেহ-প্রীতি, সংসারের সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের জীবনযাপনের কথা ইচ্ছা করে ভুলে দিনের-পর-দিন বনে-জঙ্গলে, পথে-বিপথে বিতাড়িত হয়ে ঘুরছে। তারা দুঃখীর চোখে জল দেখে তার প্রতিকার করার চেষ্টায় ব্যস্ত। দেশের শত্রু, মানবজাতির শত্রু, দুঃখীর শত্রুকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা তারা গ্রহণ করেছে। তাই তারা 'হিংস্র, করাল, মৃত্যুর মত ভীষণ'। কিন্তু যাদের মুক্তির জন্য বিপ্লবীরা অক্লান্ত কাজ করে যাচ্ছে, অকৃতজ্ঞ অন্তরে, সেই মানবজাতিই সুযোগ বুঝে তাদের শত্রুর হাতে ধরিয়ে দেয়। নজরুল, প্রমত্ত বাবুর বলিষ্ঠ কণ্ঠ দিয়ে প্রকাশ করেছেন,

> [...] আমার যদি শক্তি থাকিত, আমি এই পৃথিবীর শীর্ষে দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে ঘোষণা করিতাম,– মানব জাতির কল্যাণের জন্য, তাহাদের শৃঙ্খল মুক্ত করিবার জন্য যাহারা আজ চরম পথাবলম্বী হইয়াছে নিজেদের সকল সুখ জলাঞ্জলি দিয়া, তাহাদের হিংস্র আখ্যায় অভিহিত করে যাহারা, তাহারা অকৃজ্ঞ, নীচ, সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের মানব জাতির কলঙ্ক।[৯৫]

হিন্দু-মুসলমানের মিলিত করার মানসিকতা এই উপন্যাসে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। নজরুলের মতে ভারত যেদিন এক জাতি হবে সেদিনই ইংরেজকে 'বোঁচকা-পুটলি' বাঁধতে হবে। ব্রিটিশকে ভারতবর্ষ থেকে তাড়ানোর জন্যে যে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য একান্ত প্রয়োজন, বৃহত্তর স্বার্থ লাভের লোভ দেখিয়ে তিনি হিন্দু-মুসলমানের মাঝে সম্প্রীতি বাড়িয়ে তোলার যে চেষ্টা প্রকাশ করেছিলেন তাই এই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে।

[৯২] 'কুহেলিকা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৮, ২১শে জুলাই ১৯৩১।
[৯৩] 'নজরুল রচনা-সম্ভার', কলিকাতা, ১৩৭৭।
[৯৪] 'কুহেলিকা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৮, ২১শে জুলাই ১৯৩১।
[৯৫] 'কুহেলিকা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৮, ২১শে জুলাই ১৯৩১।

'কুহেলিকা' উপন্যাসের নায়ক জাহাঙ্গীর, তাকে নিয়েই কুহিলিকার রহস্য সৃষ্টি, তার জন্ম সম্বন্ধে যেমনি তেমনি জীবন সম্বন্ধেও। তৈরি হয় ফিরদৌস, ভূণী ও চম্পাকে নিয়ে জাহাঙ্গীরের ত্রিভূজ-জগৎটি। এতে নারীবাদ ও সাম্যবাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, সম্প্রদায়িক ব্যঞ্জনাও বাদ পড়েনি।

জাহাঙ্গীর কুমিল্লার এক সম্ভ্রান্ত ও ধনী জমিদারের একমাত্র সন্তান। ওর পনেরো বছর বয়সে তার বাবা মহাপ্রস্থান করেন। নায়কের বাবা বেঁচে থাকতে কখনও তিনি তার স্ত্রী-পুত্রকে দেশের বাড়ি কুমিল্লায় যেতে দেননি। অধিকাংশ সময়ই তাদের কলকাতায় কাটাতে হয়। জাহাঙ্গীরের মা ফিরদৌস বেগম। তিনি জীবিত। কলকাতার দু'চারটি বাড়ি ভাড়া দিয়ে বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনার উদ্দেশ্যে কুমিল্লায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছেন। ফিরদৌস বেগমের মাতৃস্নেহে যেমন খাদ নেই, তেমনি জমিদারি পরিচালনাও তিনি কঠোর। জ্ঞাতিদের চক্রান্ত তিনি কৌশলে বানচাল করে দেন, এতে তার তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রকাশই ঘটে, তাই হয়ত হিন্দুরা এই প্রবল-প্রতাপান্বিতা রমণীকে 'রায়বাঘিনী' বলে ডাকে, আর মুসলমানরা বলে 'ঘরে দজ্জাল'।

জাহাঙ্গীর প্রথম প্রথম কলকাতার হোস্টেলে থেকে স্কুলে, কলেজে পড়াশোনা করে, কিন্তু এই কয়েদীর জীবন সহ্য করতে না-পারে মেসে এসে আস্তানা গাড়ে। জাহাঙ্গীর স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষালাভ করতে বিপ্লবী দলের প্রভাবে এসে তাদের দলে যোগ দিতে চায়। সে মুসলমান বলে সংগঠনের কেউ কেউ আপত্তি তুলে, তবে শেষপর্যন্ত প্রমত্তের যুক্তি মেনে নিয়ে তার সদস্যপদের আবেদনটি মঞ্জুর হয়। একদিন জাহাঙ্গীর জানতে পারে যে, সে 'জারজ'পুত্র। তার পিতার অবৈধ সন্তান। তার মা ছিলেন এক বিখ্যাত বাঈজী ও প্রায়ত জমিদারের রক্ষিতা। এজন্যেই জাহাঙ্গীরের বাবা খান-বাহাদুর ফররোখ শাহেব তাকে ও ফেরদৌস বেগমকে আড়াল করে রাখতেন। একদিন ছেলের মুখে ফিরদৌস বেগম তার অতীত জীবনের কথা শুনে বিমর্ষ হন, নিজের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায় যেন; কারণ, জাহাঙ্গীর তার গোপন লজ্জা জেনে ফেলেছে। ক্ষোভে, লজ্জায় জাহাঙ্গীর যখন প্রায় ভেঙে পড়ে তখন প্রমত্ত বললেন,

> গভীর স্নেহে জাহাঙ্গীরকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, [...] ওতে তোর লজ্জার কি আছে বলত। যদি লজ্জিতই হতে হয় বা প্রায়শ্চিত্তই করতে হয় ত তা করেছে, করবে বা করছে তারা, যারা এর জন্যে দায়ী। কোনো অসহায় মানুষই ত তার জন্মের জন্যে দায়ী নয়![৯৬]

জাহাঙ্গীর অনেকটা শান্ত ও সুস্থ হয়। সে স্থির করে, দেশ সেবার মহান ব্রতীগ্রহণ করে তার মায়ের পাপের প্রায়চিত্ত করবে; তবু তার মা ও সাধারণভাবে নারীজাতির প্রতি তার ঘৃণা ও অবিশ্বাস পুরোপুরি দূর হয় না, তার মনের কোণে একটি গভীর সন্দেহ থেকে যায়।

জাহাঙ্গীরের জীবন আবার এক অপ্রত্যাশিত পথে মোড় নেয়। সহপাঠী বন্ধু হারুনের সঙ্গে সে তার দেশের বাড়িতে বেড়াতে আসে। হারুন খুব খুশি মনে ধনী বন্ধুকে সেখানে নিয়ে আসে না; কারণ, হারুণের পরিবার সম্ভ্রান্ত হলেও হতদরিদ্র। হারুনের মা তার আর-এক ছেলের মৃত্যুর শোকে পাগল। বাবা অন্ধ। তাছাড়া হারুণের আরও তিনটি ভাইবোন আছে। তাদের মধ্যে কিশোরী তহমিনা ওরফে ভূণী অনন্যা। জাহাঙ্গীর যখন তার বন্ধুর বাড়িতে অতিথি, তখন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। হারুনের মা হঠাৎ আল্লাহর নাম করে ভূণীকে জাহাঙ্গীরের হাতে তুলে দেন। এর ফলে খুবই অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। ব্যাপারটিকে নিছুক পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সবাই বুঝতে পারে, উন্মাদিনীর দৃষ্টিতে একধরণের সত্য ধরা পড়েছে। ভূণী সদ্য পরিচিত, গ্রীক দেবতার মতন সুদর্শন জাহাঙ্গীরকে তার মনপ্রাণ নিবেদন করে। সাধারণভাবে মেয়েদের প্রতি সন্দেহের রেশ, কলঙ্কিত জন্মের লজ্জা, একজন বিপ্লবীর পক্ষে সংসার-ধর্ম সাজে কী না– এসব জাহাঙ্গীরের মনে সংশয় সৃষ্টি করে। শেষপর্যন্ত সে যে-শর্তে ভূণীকে গ্রহণ করতে চায়, সে-শর্ত ভূণী সদর্পে প্রত্যাখান করে। চরম দুর্দশার মধ্যেও ভূণীর বুদ্ধি ছায়াচ্ছন্ন

[৯৬] 'কুহেলিকা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৮, ২১শে জুলাই ১৯৩১।

হয় না, তার তীক্ষ্ণ আত্মসম্মান হার মানে না, তার স্বপ্নের রাজপুত্র কুঁড়ের ঘরে পা দিলেও সহজে নিজেকে বিলিয়ে দেয় না।

বিপ্লবী কাজের সূত্র ধরে, ঘটনাচক্রে, জাহাঙ্গীরের পরিচয় ঘটে জয়ন্তী ও চম্পার সঙ্গে। জয়ন্তী একজন জননী, তার মাতৃহৃদয় সকল বিপ্লবীকে স্থান করে নেয়। জয়ন্তী পুত্রতুল্য বোনপোকে হারান ফাঁসির মঞ্চে, তাই জাহাঙ্গীরকে দেখা মাত্রই তার বোনপোর ছবিটি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। প্রসঙ্গত, জয়ন্তী-মাসিমার উক্তির মাধ্যমে নজরুল অস্পৃশ্যতা-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেছেন; কারণ, তিনি জানতেন যে, বিপ্লবী-আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অস্পৃশ্যতার মত বিভেদ সৃষ্টিকারী সমস্যাকে খণ্ডাতে হবে। জয়ন্তী-মাসিমা জাহাঙ্গীরকে বললেন,

> মানুষকে মানুষ ছুঁলে স্নান করতে হয়, মানুষের এত বড় অবমাননাকর শাস্ত্র সৃষ্টি হয়েছিল বলেই আমাদের এই দুর্দশা। জানি না তুই কি জাত, কিন্তু তুই যদি হাড়ি ডোমও হতিস তা হলেও তোকে ছুঁতে এতটুকু ইতস্তত হত না আমার।[৯৭]

এসব কথা প্রকাশের উদ্দেশ্যই হচ্ছে নজরুলের অন্তর জুড়ে ছিল মানবকল্যাণের স্বপ্ন। ধর্ম-সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে নজরুল কখনওই সতর্কতা অবলম্বন করেননি। তাই এই উপন্যাসে নজরুলের ধর্মবিষয়ক রসিকতাও সহজে প্রকাশিত হয়েছে; যেমন, রায়হান হাঁচি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারিক 'সুরে ইয়াসিন' পড়তে থাকে; আমজাদ কাছা খুলে আজান দেয়। নজরুলের ধর্ম-বিরোধী বক্তব্য আরও বেশি জোরালোভাবে প্রকাশিত হয়েছে এই উপন্যাসে, প্রমত্তের মন্তব্যের মাধ্যমে। রাষ্ট্রীয়-স্বাধীনতা-বিপ্লবের উদ্দেশ্যে ধর্ম যে বাঁধা সাধে এ-সম্বন্ধে নজরুল সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

> বিপ্লব যদি বিপ্লবের জন্যই না হইয়া ধর্মের জন্য হয়, তবে সে-বিপ্লবের আয়ু দু'রাত্রির বেশি নয়। [...] ধর্মের গোঁড়ামি লইয়া বিপ্লবের শুরু বলিয়া অতবড় সিপাহী-বিদ্রোহটাই ব্যর্থ হইয়া গেল। শূকর ও গরুর চর্বির অজুহাতে মানুষকে ক্ষেপানো বেশিদিন চলে না। [...] অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের পরিসমাপ্তিতেই ফ্রান্সের বিপ্লব সার্থক হইয়াছিল। ধর্মের মদ খাওয়াইয়া মানুষকে মাতাল করিয়া তোলা যাইতে পারে, নাচাইতে ও ক্ষেপাইতেও হয়ত পারা যায়, কিন্তু তাহাদের বিপ্লবপন্থী করিয়া তুলিতে পারা যায় না। রাষ্ট্রীয় বিপ্লব যদি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য না আসিয়া আরো লক্ষ কতক মন্দির মসজিদের সৃষ্টির জন্যই হয়, তবে সে বিপ্লবও আসিবে না– সে স্বাধীনতাও টিকিবে না।[৯৮]

বিপ্লবীদের মাঝে যে সাম্প্রদায়িকতা থাকতে পারে তাও প্রকাশ পেয়েছে এই উপন্যাসে। কোনও কোনও বিপ্লবীদের মুখে শুনা যায়,

> আমার ডান হাত দিয়ে তাড়াবো ফিরিঙ্গী এবং বাম হাত দিয়ে খেদাব নেড়ে।[৯৯]

জাহাঙ্গীরের মা সবকিছু জানতে পেরে ভূণীকে সাদরে বধূরূপে বরণ করতে উদ্যোগী হন। তিনি পরম উদারতা ও স্নেহে ভূণীর মত একজন গরিব কিন্তু রত্নতুল্য মেয়েকে ঘরে আনতে চান; কারণ, এর ফলে তার ছেলে আবার মায়ের আপন হতে পারে, জাহাঙ্গীরের জন্মকলঙ্ক ভুলে সে হয়ত নতুন জীবন গড়ে পারে। ছেলেকে নিয়ে ফেরদৌস বেগম ভূণীদের বাড়িতে আসেন। একরাতে, চরম আবেগের ক্ষণে জাহাঙ্গীর ভূণীকে পুরোপুরি আপন করে নেয়। তারপর শুরু হয় অনুতাপ, লজ্জা। মনে পড়ে যায়, এই ঘটনাটি তার ক্লেদাক্ত উত্তরাধিকারের চিহ্ন। দৈহিক পবিত্রতা হারানোর পর ভূণীর মনের শক্তিও নষ্ট হয়ে যায়। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী তার মর্যাদা বলে যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তা আর থাকে না। সে যেন সবকিছু, তার মনের বিরুদ্ধে, মেনে নিতে বাধ্য হয়, তাই যা হতে পারত মধুরমিলন তা পরিণত হয় চরম পরাজয়ে।

---

[৯৭] 'কুহেলিকা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৮, ২১শে জুলাই ১৯৩১।
[৯৮] 'কুহেলিকা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৮, ২১শে জুলাই ১৯৩১।
[৯৯] 'কুহেলিকা', কাজী নজরুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩৮, ২১শে জুলাই ১৯৩১।

এরইমধ্যে জাহাঙ্গীর ও চম্পার মধ্যেও গড়ে ওঠে এক ধরণের আকর্ষণ। আত্মধিক্কারে জর্জরিত জাহাঙ্গীরকে চম্পা বোঝায়, বিপ্লবীরাও রক্তমাংসের মানুষ, দেবতা নয়। অনেক বিপ্লবীকে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হয়। চম্পা এক অগ্নিকন্যা, আবার পরিপূর্ণ নারীও বটে। সে অপরূপা সুন্দরী। তার রূপের পাশে ভূণী ম্লান হয়ে যায়। সে জাহাঙ্গীর সম্বন্ধে নিজের মনোভাব অকপটে প্রকাশ করে, কিন্তু বিপ্লবব্রত কর্মকাণ্ডে অটুট থাকে। চম্পার পরিণত মানসিকতা আর বাস্তব জ্ঞান তার বয়সের পক্ষে বিস্ময়কর বটে। পরিশেষে, বিপ্লবী অভ্যুত্থান বিফল হওয়ার ফলে জাহাঙ্গীর ধরা পড়ে যায় পুলিশের হাতে। স্বদেশকুমার ছদ্মনামে তার দ্বীপান্তর হয়। ফেরদৌস বেগম তার ভগ্ন হৃদয়ে শান্তির আশায় ও অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তীর্থ-যাত্রার উদ্দেশ্যে মক্কায় যান। দ্বীপান্তর হওয়ার আগে জাহাঙ্গীর তার সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ ভূণীকে আর বাকি অংশ চম্পার হাতে রেখে তুলে দেয়।

এই উপন্যাসের সবচেয়ে জীবন্ত, বৈচিত্র ও আকষণীয় বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে নারী চরিত্রগুলি: বাঈজী ও জমিদার গৃহিনী ফিরদৌস বেগম, পড়তি খানদানি ঘরের অপূর্ব রূপবতী কিশোরী ভূণী, বিপ্লবী দলের সদস্য প্রৌঢ়া জয়ন্তী ও কিশোরী চম্পা। জাহাঙ্গীরের দ্বীপান্তর না-হলে ভূণী হয়ত কুমিল্লার জমিদার বাড়িতে ঢুকতে পারত। ফিরদৌস বেগম ও ভূণীর জীবন এবং পরিণতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হত। তবু দুজনের কাহিনী থেকে একটি কথাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পুরুষশাসিত সমাজে নারীর মানমর্যাদার যে সংজ্ঞাটি সৃষ্টি হয়েছে তা অন্তঃসারশূন্য।

নাটক

নজরুল শৈশবকালেই যাত্রা, নাটক ও বিভিন্ন পালাগানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ছিলেন লেটোদলের গানের ওস্তাদও। এ জন্য তাঁকে 'গোদা কবি' বলা হত। তিনি তাঁর নাটক রচনায় বাংলাদেশের লোক-নাট্যের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। নজরুলের রচনাগুলি হচ্ছে: (১) শৈশবকালের– 'চাষার সঙ', 'মেঘনাদ বধ', 'শকুনি বধ', 'দাতাকর্ণ', 'রাজপুত্র', 'আকবার বাদশাহ', 'কবি কালিদাস' প্রভৃতি; (২) পরিণত বয়সের– 'ঝিলিমিলি', 'মধুমালা', 'আলেয়া' ও 'সাপুড়ে'[১০০]। মোট ৮৪টি নাটক-নাটিকা, কমিক ও নাট্যরূপ কর্মের সঙ্গে নজরুল জড়িত ছিলেন; এরমধ্যে তাঁর ছিল ৫৯টি এবং অন্যদের ২৫টি নাটক। সঠিক অর্থে সবগুলিই নাটক নয়, পণ্ডিতগণ যেগুলিকে নাটক বলে চিহ্নত করেছেন সেগুলি হচ্ছে: 'ঝিলিমিলি'[১০১]; 'আলেয়া'[১০২]; 'পুতুলের বিয়ে'[১০৩] ও 'মধুমালা'[১০৪]। 'ঝিলিমিলি', 'শিল্পী', 'সেতুবন্ধ' ও 'ভুতের ভয়' নাটকগুলি নজরুলের নাটক সংকলন 'ঝিলিমিলি'[১০৫]তে প্রকাশ হয়। 'ঝিলিমিলি', 'শিল্পী', 'সেতুবন্ধ' ও 'ভূতের ভয়' নজরুলের অন্যূন্য সৃষ্টি।

'ঝিলিমিলি': প্রতীক-নাটক। নজরুলের প্রথম প্রকাশিত নাটক। তিন অঙ্কের এই নাটকে তিনটি গানও যুক্ত হয়েছে, যথা: 'হৃদয় যত নিষেদ্ধ হানে নয়ন ততই কাঁদে', 'শুকাল মিলন-মালা, আমি তবে যাই' ও 'স্মরণ পারের ওগো প্রিয় তোমায় আমি চিনি যেন'। 'ঝিলিমিলি'র প্রথম দৃশ্যে নায়িকা ফিরোজা দ্বিতলের একটি ঘরে রোগশয্যায় শয্যাশায়ী। পশ্চিমের একটি জানালা ছাড়া অন্যগুলি বন্ধ, বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। হালিমা বিবি তার মেয়ের শুশ্রূয়ায় ব্যস্ত। রোগশীর্ণস্বরে ফিরোজা তার মাকে পূর্ব দিকের জানালাটি খুলে দিতে অনুরোধ করে, কারণ 'পূবের হাওয়ায় কদম ফোটে', কিন্তু মা খুলে দেন না, সেদিকের জানালাটি খুললে ফিরোজার বাবা মীর্জা শাহেব তাকে 'জ্যান্ত' রাখবেন না। ফিরোজার বারবার করুণ মিনতিতে তার মা হালিমা বিবি নিশ্চুপ থাকতে পারেন না, শেষপর্যন্ত খুলে দেন পূর্ব দিকের জানালাটি। জানালাটি খুলে দিতেই সামনের বাড়ির মৃদু-আলোকিত বাতায়ন ফিরোজার চোখে পড়ে, দৃষ্টিতে ধরা দেয় জানালার পাশে দাঁড়ানো একটি নিশ্চল ছায়া-মূর্তির, এই অস্পষ্ট মূর্তিটি তার প্রেমিক হাবিবের। ফিরোজা 'ব্যাকুল দৃষ্টিতে বাতায়ন-পথে' তাকিয়ে থাকে, শুনতে চায় প্রেমিকের গান, বাঁশির সুর আর এস্রাজের ঝঙ্কার। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বাতায়নের আলো আরও একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, অস্পষ্ট মূর্তিটিও কিছুটা স্পষ্ট হয়। ফিরোজা আবারও তার মাকে অনুরোধ করে, এবার সে চায় হালিমা বিবি যেন ঘরের বাতিটি 'খুব উজ্জ্বল' করে জ্বেলে দেন; যাতে সে মূর্তিটিকে 'খুব ভাল' করে দেখতে পায়, কিন্তু ঘরের বাইরে মীর্জা শাহেবের 'পদশব্দ' শুনতে পেয়ে হালিমা বিবি ফিরোজার অনুরোধ রাখতে পারেন না। মীর্জা শাহেব ফিরোজা-হাবিবের মিলনপথের প্রধান প্রতিবন্ধক। সামাজিক মর্যাদার অন্ধমোহে আপ্লুত মীর্জা শাহেব, তাই তিনি হাবিবের হাতে তার মেয়েকে তুলে দিতে নারাজ। হাবিব বি.এ. পাশ করেনি ও গানবাজনা করে বলে মির্জা শাহেব তার হাতে মেয়েকে সঁপে দিতে অনিচ্ছুক। জানালাটি খোলা দেখে তিনি হালিমা বিবিকে তিরস্কার করে বলেন, '[...] আর যা-ই কর, ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে চেষ্টা করো না।' এমন সময় দরজায় করাঘাত শোনা যায়। দরজা খোলার জন্য হাবিব অনুরোধ জানালে মীর্জা শাহেব তাকেও তিরস্কার করে বলেন, 'দেখেছ ব্যাটার মতলব! নিশ্চয় সঙ্গে পুলিশ নিয়ে এসেছে।' কঠিন ভাষায় তাকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। ফিরোজা অভিমানক্ষুব্ধ

[১০০] টীকা: ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে চলচ্চিত্রে রূপায়ীত হয়।
[১০১] টীকা: কৃষ্ণনগরে ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। 'নওরোজ' মাসিক পত্রিকায় আষাঢ় ১৩৩৪ সালে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। গ্রন্থাকারে প্রকাশ: অগ্রহায়ণ ১৩৩৭।
[১০২] 'আলেয়া' (পূর্ণাঙ্গ নাটক), কাজী নজরুল ইসলাম, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ (১৯৩১)।
[১০৩] 'পুতুলের বিয়ে' (একাঙ্ক ছোটদের নাটিকা ও কবিতা), কাজী নজরুল ইসলাম, চৈত্র ১৩৪০, এপ্রিল ১৯৩৩।
[১০৪] 'মধুমালা' (তিন অঙ্কে রচিত পূর্ণাঙ্গ গীতিনাটক), কাজী নজরুল ইসলাম, মাঘ ১৩৬, জানুয়ারী ১৯৬০।
[১০৫] 'ঝিলিমিলি' (নাটক সঙ্কলন), কাজী নজরুল ইসলাম, অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, নভেম্বর ১৯৩০।

কণ্ঠে বলে, 'কেন এত অপমান সইছ আমার জন্যে, তুমি যাও। আমি তোমায় পেয়েছি।' হাবিবকে সে অনুরোধ করে, 'তুমি তোমার বাতায়নের ঝিলিমিলি খুলে রেখো।' হাবিব চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে ফিরোজা 'মূর্চ্ছিত' হয়ে পড়ে। এ-অবস্থা দেখে মীর্জা শাহেবের হৃদয়ে পরিবর্তন আসে। তার মধ্যে বাৎসল্যানুরাগ প্রবল হয়ে ওঠে বলেই তিনি হাবিবের অন্বেষণে 'বিদ্যুৎবেগে' বেরিয়ে পড়েন। দ্বিতীয় দৃশ্যে স্বপ্নরাজ্যের উদ্ভাবন ঘটে। দু-বাড়ির মাঝখানে অবস্থিত জানালাটুকুর 'ঝিলিমিলি' হচ্ছে ফিরোজা-হাবিবের মিলনের সেঁতু। সেদিকে তাকিয়ে ফিরোজা হাবিবের সান্নিধ্যসুখ অনুভব করে তৃপ্তি পতে চায়, কিন্তু তা হয়ে ওঠে না, সমাজের অভিজাতগর্বী সম্প্রদায়ের প্রতীক ফিরোজার পিতা সে 'ঝিলিমিলি' বন্ধ করে রাখেন। বাস্তবজীবনের দৈহিকমিলনের পথটি তখন রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ফিরোজার মুক্তাত্মার অনুভূতির সাহায্যে বাস্তবজগৎ অতিক্রম করে ছুটে চলে অনন্তের পানে– স্বপ্ন রাজ্যের দিকে, যেখানে প্রণয়ী-প্রণয়িণীর মিলনে কোনও বাধা থাকে না, কোনও সামাজিক বিধিনিষেধের নিয়মকনুনও না। তৃতীয় দৃশ্যে ফিরোজা পালঙ্কে অচেতন, ঘরে ডাক্তার, পাশে হালিমা ও মীর্জা শাহেব। পরিবেশ যেন নিবু নিবু প্রদীপশিখা। ফিরোজা যখন চোখ খুলে দেখে বাতায়ন বন্ধ তখন সে চরম আঘাত পায়। মিলনের পথটি যেন চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায় তার কাছে। সে আবার অচৈতন্য হয়ে পড়ে। মৃত্যুর দিকে যেন ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হতে থাকে। মির্জা শাহেব আবার বেরিয়ে পড়েন হাবিবের সন্ধানে। হাবিব যখন ঝড়ের বেগে প্রবেশ করে তখন ফিরোজা চাঁদ পাড়ি দিয়ে বেহেশ্‌তে চলে যায়। এখানেই নাটকের সমাপ্তি ঘটে। 'ঝিলিমিলি'র নাটকীয় কাহিনীর অন্তরালে চির-মুক্তিকামী নজরুল-মানসের আকুতি গীতিকবিতার সুর ও ঝঙ্কারে প্রকাশিত হয়। গদ্যে রচিত হলেও এর প্রাণ কাব্যিক সুরে বাঁধা, বিশিষ করে দ্বিতীয় দৃশ্যটি। অতিরিক্ত ভাবাবেগে নাটকীয় সংলাপ মাঝেমধ্যে কাব্যমধুর হয়ে ওঠে, যেমন– এ যেন 'বেহেশ্‌ত', এ যেন স্বর্গলোক, এ যেন অনন্তকাল ধরে মুখোমুখি বসে থাকা দুটি নরনারী। তাদের চোখে পলক পড়ে না, পলক পড়লেই বুঝি বিশ্বজগৎ কেঁদে উঠবে। তারা হারিয়ে যাতে চায় সুন্দর একটি স্বর্গলোকে, যেখানে শুধু থাকবে 'আমি, আর তুমি'।

'সেতুবন্ধ'[১০৬]**:** রূপক-সাংকেতিক নাটক। নজরুলের দ্বিতীয় প্রকাশিত নাটক। 'সেতুবন্ধ'-এ সাতটি গান আছে, যথা: 'গরজে গম্ভীর গগনে', 'অধীর অম্বরে গুরু গরজন মৃদঙ্‌বাজে', 'হাজার তারা হার হয়ে গো', 'নমো হে নমো যন্ত্রপতি নমো নমো অশান্ত', 'চরণ ফেলি গো মরণ-ছন্দে', 'নমো নমো নম হিম-গিরি সূতা' ও 'হর হর শঙ্কর! জয় শিব শঙ্কর'।[১০৭] 'সেতুবন্ধ' নাটকে রূপক-সাংকেতিকতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ও মানব শক্তির মাঝে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের প্রকাশ ঘটানো হয়েছে। একদিকে যন্ত্র-শক্তি, মানব-শক্তি, বস্তু-শক্তি আর অন্যদিকে প্রাকৃতিক-শক্তি, দেব-শক্তি, জীব-শক্তি। তবে প্রাকৃতিক-শক্তির মাহাত্ম্যের কথাই ঘোষিত হয়। যন্ত্র-শক্তি যে মানুষের জীবনের সহজ, স্বচ্ছন্দ, গতিছন্দ ও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মভূত হওয়ার অনুভূতি থেকে বঞ্চিত তারই সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে। তাই ত এ-নাটকের কয়েকটি চরিত্রে প্রাকৃতিক-শক্তির গুণ আরোপিত হয়েছে। সঙ্গীত ও প্রতীক-সজ্জার ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যময়-মণ্ডিত। এর একটি চমৎকার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে পত্র-পাত্রির নামকরণের দিক থেকে। এ-সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা আবশ্যক। প্রাকৃতিক-শক্তির নামকরণগুলি নজরুল করেছিলেন একজন দক্ষ কবির মত, যেমন– 'কুশীলব', মেঘলোকের নায়ক 'মেঘ'; 'মেঘ'-এর সহচরী বৃষ্টিধারারূপীরা– 'চূর্ণী', 'নারী', 'বিন্দু', 'নীপা', 'কৃষ্ণা', 'অশ্রু', 'মঞ্জু', 'বেরা', 'চিত্র' প্রভৃতি; জলদেবীরা– 'পদ্মা', 'তরঙ্গিণী', 'সলিলা', 'অনিলা', 'তটিনী', 'নির্ঝরিণী' প্রভৃতি। আবদুল আজীজ আল্-আমান এ-সম্বন্ধে বলেছেন, 'প্রতিটি নামের মধ্য দিয়ে মেঘপুঞ্জ এবং বৃষ্টিধারার প্রতিচ্ছবি ইঙ্গিতবহ হয়ে ফুটে উঠেছে।/ মেঘ এবং বৃষ্টির কোন না কোন রূপ এবং চিত্র এই নামকরণের মধ্য দিয়ে কাব্যরূপ লাভ করেছে।'[১০৮] মেঘের রূপসজ্জার দিকে দৃষ্টিপাত করলেও দেখা যায় একই ছবি; যেমন– অঙ্গ নীলাঞ্জন

[১০৬] টীকা: প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্য প্রকাশিত হয় 'নওরোজ' পত্রিকায় শ্রাবণ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে 'সারা-ব্রীজ' শিরোনামে, কিন্তু তৃতীয় দৃশ্যটি কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

[১০৭] পুস্তক-পরিচিতি, নজরুল রচনা-সম্ভার; ২৫ মে ১৯৮০।

[১০৮] 'নজরুল রচনাসম্ভার', কলিকাতা, ১৩৭৭।

অনুলিপ্ত, পরণে শ্লেট-রঙয়ের ধড়া ও ঢিলা নিমাস্তিন, স্কন্ধদেশে ছড়িয়ে আছে উচ্ছৃঙ্খল ঝামর চুল, ফিকে-নীল ফিতেয় চুড়া বাঁধা, নয়নে স্নিগ্ধ কাজল, ললাটে বহ্নিশিখা-রং-এর রক্তচন্দন, পৃ'দেশে সাতরঙা বিরাট জলধনু। অন্যদিকে নজরুল যন্ত্র-শক্তির রূপসজ্জা এঁকেছেন অন্যভাবে, যেমন– 'স্থূলকায়', 'কদাকার', 'অন্ধদৃষ্টি', 'দন্ত-নখ বৃহৎ', 'দক্ষিণ হস্তে জাঁতাকল', 'বাম হস্তে প্রকাণ্ড সিগার' প্রভৃতি। অবশ্য এ-নাটকে নজরুল-চিত্তই জয়লাভ করেছে, যন্ত্র-শক্তির পরাজয় ঘটিয়ে। নজরুল-মানস প্রকৃতির চির পূজারী, তাই তাঁর উপর প্রকৃতির প্রভাব অপরিহার্য। নজরুল যে, প্রকৃতিকে খুবই ভালোবাসতেন তারই প্রকাশ ঘটেছে 'সেতু-বন্ধ' নাটকে।

'ভূতের ভয়': রূপক-নাটক। এ-নাটকে নজরুলকে দেশপ্রেমিক হিশেবে আবিষ্কার করা যায়। স্বদেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য নজরুল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-বিপ্লবের ইতিবৃত্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। ইংরেজরা ভূত, দেবকুলরা ভারতবাসী আর স্বর্গরাজ্য হচ্ছে ভারতবর্ষ। ভূতেরা স্বর্গরাজ্য দখল করায় দেবকুল তাদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু এই প্রস্তুতি পর্বে, অর্থাৎ স্বাধীনতা-সংগ্রামে দেবকুল দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল বিশ্বাস করেন অহিংস বিপ্লবে, আর অন্যদল সশস্ত্র বিপ্লবে। একদল সত্যাগ্রহী আর অন্যদল অস্ত্রাগ্রহী। সত্যাগ্রহী দলের প্রধান জয়ন্তকুমার, তিনি গান্ধীবাদে বিশ্বাসী। অস্ত্রাগ্রহী দলের প্রধান বিপ্লবকুমার, তিনি রক্ত-সংগ্রামে বিশ্বাসী। নাটকে তিনটি দৃশ্য রয়েছে, এবং তিনটি গানও। গানগুলি হচ্ছে: 'জাগো জাগো দেব-লোক– ভূতের ভয় থেকে', 'মোরা মারের চোটে ভুত ভাগাব' ও 'ব্রজ আলোকে মৃত্যুর সঙ্গে হবে নব পরিচয়'।[১০৯] প্রথম দৃশ্যে চলে প্রস্তুতি পর্ব। ভূতের দলের স্বর্গরাজ্য জয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেবরাজ্যের অধিবাসীবৃন্দ মাভৈঃ মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে আত্মজাগৃতির পথে তাদের এগিয়ে যেতে দেখা যায়। দ্বিতীয় দৃশ্যে তাদের কথোপকথন, মতদ্বৈততার পটভূমিতে আত্মকলাহল। তৃতীয় দৃশ্যে সংঘর্ষ, আত্মবিসর্জন ও আত্মজাগৃতির দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাণোৎসর্গের মাধ্যমে দেশবাসীর মনে নব-প্রাণ-সঞ্চারের প্রচেষ্টা করা হয়েছে এ-দৃশ্যে, তাই নায়ক বিপ্লবকুমার আত্মঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত। এই সংগ্রাম অবশ্যই ধ্বংসের, কিন্তু আত্মবিসর্জনের মধ্য-দিয়ে তিনি ভারতবাসীকে আত্মজাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চ চ্ছেন। তিনি নব সৃষ্টির জন্যে বৃহত্তর কল্যাণবোধে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। শেষ দৃশ্যে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সুস্পষ্ট একটি চিত্র ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ-নাটকে স্বাধীনতার বিক্ষুব্ধ আলোড়ন, আন্দোলনের চিত্রটি ফুটে উঠেছে। কাহিনী, চরিত্র-চিত্রণ, গতিধর্মিতা, সঙ্গীত প্রয়োগ– এক কথায় সবদিক থেকেই এ-হচ্ছে একটি সার্থক নাটক।

'শিল্পী': প্রতীক-নাটক বা রূপক-সাংকেতিক নাটক। এতেও নজরুলের নিজস্ব জীবনসত্ত্ব ও ব্যক্তি-মানসই প্রকাশিত হয়েছে, তবে রোমান্টিকতার আবেগে আপ্লুত। এর কাহিনী গড়ে উঠেছে 'সংসার-নির্ভর মানবিক-বন্ধন' ও 'মুক্ত-শিল্পী সত্তা' এই উভয় দ্বন্দ্বের পটভূমিতে। এর নায়ক, শিরাজ। সে একজন চিত্রকর ও চিরসুন্দরের উপাসক। নায়িকা লাইলী। সে একজন তেজস্বিনী ও শিল্পের পূজারী। সে সমাজের সকল বিদ্রোহকে উপেক্ষা করে শিরাজকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে, সংসার পাতে, এবং অন্য দশজন নারীর মত সে তার স্বামীকে একান্তভাবে পেতে চায়। চায় স্বামীর কোলে মাথা রেখে, পুত্র-কন্যা আত্মীয়-স্বজনের মাঝে, বাড়ি ভরা 'ক্রন্দনের তৃপ্তি' নিয়ে, সে চিরজন্মের মত এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে। কিন্তু শিল্পী শিরাজ অন্য দশজন সংসারি-মানুষের মত তার স্ত্রীর বন্ধনের মাঝে আবদ্ধ থাকতে চায় না, এমনকী সে চায় না এই বন্ধনের মাঝে ধরা দিতেও, তাই ছুটে চলে যায় চিত্রার কাছে। শিরাজকে জড়িয়ে চিত্রা চায় চুমু খেতে, কিন্তু শিরাজ কামনাজাত এই বন্ধনকে উপেক্ষা করে। শেষপর্যন্ত, চিত্রা যখন বিদায় নিতে চায়, শিল্পী শিরাজ তখন তার চোখের অশ্রুকে ধরে রাখতে পারে না। এ-নাটকে এক মহৎ শিল্পানুভূতির জন্ম লাভ করেছে। আবদুল আজীজ আল্-আমান এ-নাটকটি সম্বন্ধে বলেছেন, 'কাহিনীতে একটি গতি আছে, নাটকীয় সংঘাত আছে, ভাষা অনেক বেশী পরিশীলিত– সর্বত্র সযত্ন লালনের চিহ্ন বর্তমান, চরিত্র

[১০৯] পুস্তক-পরিচিতি, 'নজরুল রচনা-সম্ভার', ২৫ মে ১৯৮০।

সৃষ্টিতে পূর্ণ সাফল্য অর্জিত না হলেও একেবারে অসার্থক নয়, সংলাপ কাব্যের স্পর্শে অনেক বেশী সজীব এবং Lyrical prose-এ উন্নীত। ষোলকলা পূর্ণ না হলেও এ একাদর্শীকে উপেক্ষা করা যায় না– ভালবাসতে ইচ্ছে করে।'[১১০]

আলেয়া[১১১]**:** প্রতীক-গীতিনাটক। 'আলেয়া'র উৎসর্গ পত্রে নজরুল লিখেছেন, 'নটরাজের চির-নৃত্য-সাথী সকল নট-নটীর নামে 'আলেয়া' উৎসর্গ করিলাম।'[১১২] নজরুল নাটকটিকে কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে বিভক্ত করে মানবজীবনের শাশ্বত অনুভূতিগুলিকে রূপ দিয়েছেন। নাটকের ভূমিকায় নজরুল তাঁর মূল বিষয়বস্তুর ভাব ও স্বরূপ উদ্ঘাটন করে লিখেছেন, 'এই ধূলির ধরায় প্রেম ভালোবাসা– আলেয়ার আলো। সিক্ত হৃদয়ের জলাভূমিতে এর জন্ম। ভ্রান্ত পথিককে পথ হ'তে পথান্তরে নিয়ে যাওয়াই এর ধর্ম। দুঃখী মানব এরই লেলিহান শিখায় পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে।/ তিনটি পুরুষ, তিনটি নারী– চিরকালের নর-নারীর প্রতীক– এই আগুনে দগ্ধ হ'ল– তাই নিয়ে এই গীতি-নাট্য।'[১১৩] আর 'আলেয়া' সম্বন্ধে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'আলেয়ার ইঙ্গিত কী? "নারীর হৃদয় এক আলেয়া, এবং ভালোবাসা কুহেলিকাময়। এ যেন কখন কাকে পথ ভোলায় কখন কাকে চায়, তা চির-রহস্যের তিমিরে আচ্ছন্ন।" নজরুল যেন নিজের জানা কোনও জীবনের কাহিনীকেই রূপ দিতে চাইছে; যাকে সে চিরকাল অবহেলা করে এসেছে তাকেই সে ফিরে পেতে চায় তার চলে যাওয়ার পথে।'[১১৪]

'আলেয়া'র মুখ্য চরিত্রগুলিও মানবজীবনের বিভিন্ন অনুভূতির প্রতীক। প্রেমাকাঙ্ক্ষী চিত্তের প্রতীক মীনকেতু। নারীর 'রূপ-যৌবনের উচ্ছল ঝর্ণাধারা'য় তার চিত্ত বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত। নারী-সৌন্দর্য তাকে শুধু মুগ্ধই করে না, সম্মোহিতও করে। তার কাছে রাজ্য-সাম্রাজ্য প্রভাব-প্রতিপত্তি ঐশ্বর্য সবকিছুই তুচ্ছ, তাই তো সে বলে, 'সুন্দরের কাছে রাজমহিমা দেখানোর মত হাসির জিনিস আর কিছু কি আছে?' এ-যেন কবি-চিত্তের সৌন্দর্য-পিপাসার আকুলাকুতির প্রতিধ্বনি। কবির শিল্পীমনের রসচেতনা ও সৌন্দর্য উপভোগের কামনা থেকেই 'মীনকেতু'র উদ্ভব ও সৃষ্টি।

কৃষ্ণা চরিত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটাতে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনেকখানি সহায়তা করেছে। তার অন্তরের দ্বৈত অনুভূতি– একদিকে শক্তি, সৌন্দর্য ও বিরাটত্বের আকর্ষণ; অন্যদিকে চন্দ্রকেতুর প্রেমের প্রতি মানসিক দুর্বলতা– যা তাকে অনেকখানি জীবন্ত ও স্বাভাবিক করে তুলেছে। তার হৃদয়ের আত্মিকসত্তার অন্তর্দ্বন্দ্ব নাটকটিকে অনেকখানি শিল্পচাতুর্য দান করেছে। চন্দ্রকেতুকে কৃষ্ণা বলে, 'দুঃখ কোরো না বন্ধু, তোমায় বুকের প্রেম দিতে পারিনি বলেই ত চোখের জল দিই। আমি নারী, আমি জানি, হৃদয়হীনতা দিয়ে হৃদয়কে যত আকর্ষণ করা যায়, তার অর্ধেকও হয়ত ভালোবাসা দিয়ে আকর্ষণ করা যায় না। আমি ভালোবাসা পাইনি, তুমিও ভালোবাসা পাওনি– এইখানেই ত আমরা বন্ধু! কিন্তু তুমি ত আমার চেয়েও ভাগ্যবান। আমি যে কাউকে ভালোবাসতেই পারলুম না। তুমি ত একজনকে ভালোবাসতে পেরেছ।'

নারী-হৃদয়ের চিররহস্য ঘেরা প্রেমের অনুভূতিকে নজরুল কৃষ্ণা চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। আর উগ্রাদিত্যকে দিয়ে সৃষ্টি করেছেন পৌরুষ-জন্মোচিত পশুসত্তার প্রতীক। পুরুষের জাগতিক ক্ষুধা, এবং তৃষ্ণা মিশ্রিত ক্ষুধা যে-পৌরুষ নারীকে আকর্ষণ করে সে-পুরুষই উগ্রাদিত্য। কারণ, উগ্রাদিত্য বলে, 'আজ আমি সত্য বলব রাণী। আমি অসুর-শক্তি নই, আমি লোভ-দানব। আমার বাহুতে যে অমিত শক্তি, তা আমার ঐ অপরিমান ক্ষুধারই কল্যাণে। আজ আমার সত্য প্রকাশের চরম মুহূর্ত উপস্থিত।' নারী পৌরুষকে কামনা করে সমগ্র হৃদয়মন দিয়ে,

---

[১১০] 'নজরুল রচনা-সম্ভার', কলিকাতা, ১৩৭৭।

[১১১] টীকা: ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে 'আলেয়া' গীতিনাটকটি প্রথম অভিনীত হয় নাট্যনিকেতনে; রাজা রাজকিষণ স্ট্রিট, হাতিবাগ; বিকেল পাঁচটায়। প্রযোজক– শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ, পরিচালক– শ্রীসতু সেন, অধ্যক্ষ– শ্রীনির্মলেন্দু লাহিড়ী। দ্বিতীয় অভিনীত হয় একই দিন রাত ন'টায়।

[১১২] 'নজরুল রচনা-সম্ভার', কলিকাতা, ১৩৭৭।

[১১৩] 'আলেয়া', কাজী নজরুল ইসলাম।

[১১৪] 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ১৩৭৬।

এবং একদিন একে আশ্রয় করেই তার 'বড় আমি'র তৃষ্ণা মেটায়। জয়ন্তী বলে, 'ও যে আমার শক্তি, লোভ, ক্ষুধা সব– ঐ লোভ, ঐ ক্ষুধার শক্তি নিয়েই যে তোমায় জয় করতে বেরিয়েছিলুম। মীনকেতু! আজ আমার প্রথম মনে হচ্ছে, আমি রাজ্য শাসনের রাণী নই, অশ্রুজলের রাণী।' পুরুষচিত্তের প্রেম ও সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা নারীচিত্তকে জয় করতে সমর্থ করে না, নারী চায় পুরুষের মাঝে পৌরুষেরই আত্মপ্রকাশ। বিভিন্ন ভাবের প্রতীকরূপে চরিত্রগুলি বাহ্যিক ঘটনাবর্তেই জড়িত হয়ে পড়েছে। এই নাটকের ঘটনা-সংস্থানে বাহ্যিক ঘনঘটাই দৃষ্ট হয়েছে; অর্ন্তদ্বন্দ্বের বিশেষ অবকাশ ঘটিয়ে নয়। এ-নাটকে সৌন্দর্য-পিপাসু দুর্দম যৌবনের দূত নজরুল-আত্মা নিজেকে প্রচ্ছন্ন বা নৈর্ব্যক্তিক রাখতে পারেনি। মীনকেতু ও উগ্রাদিত্যের সংলাপের মধ্য-দিয়ে নজরুলের অন্তরপুরুষ বহুক্ষেত্রেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

পুতুলের বিয়ে[১১৫]**:** ছোটদের জন্যে, কৌতুক-মিশ্রিত একটি গীতপ্রধান ও কিঞ্চিৎ উদ্দেশ্যমূলক সামাজিক নাটক। কমলি, টুলি, বেগম, খেঁদি আর পঞ্চি এই পাঁচটি মেয়েকে নিয়ে এ নাটকটি সৃষ্টি করেন নজরুল। কমলির চীনে ডালিমকুমারের সঙ্গে টুলির মেম ও বেগমের জাপানী পুতুলের বিয়ে নিয়ে নানা ঘটনার সমাবেশে এর কাহিনী আবর্বিত হয়েছে। এই নাটকের পরিস্থিতি, চরিত্র, সংলাপ ও কাহিনী নিমার্ণের দিকে অনেকটা পরিণত শিল্পকর্মের পরিচয় পাওয়া যায়।

উদ্দেশ্য মূলক বলতে কাহিনীর মাঝে হিন্দু-মুসলমানের একটি মিলনের একটি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। নজরুল শুধু কবিতার মধ্য-দিয়েই বড়দের জন্যেই নয়, একইসঙ্গে ছোটদের জন্যেও অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রকাশের চেষ্টা করেছেন, যেমন–

> কমলি– না ভাই, ও কথা বলিসনে। বাবা বলেছেন, হিন্দু মুসলমান সব সমান। অন্য ধর্ম্মের কাউকে ঘৃণা করলে ভগবান অসন্তুষ্ট হন। ওদের আল্লাও যা, আমাদের ভগবানও তা। বাবা আমাকে একটা গান শিখিয়ে ছিলেন, টুলি, তুইও ত জানিস ও গানটা, গা না ভাই আমার সঙ্গে।
> মোরা এক বৃত্তে দুটী কুসুম হিন্দু-মুসলমান।
> মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।
> [...]
> মোরা এক ভাষাতে মাকে ডাকি, এক সুরে গাই গান।
> (গান)
> টুলি– সত্যি ভাই, এক দেশে, এক মায়ের সন্তান। অন্য ধর্ম বলে কি তাকে ঘেন্না করতে হবে?

চরিত্রগুলির আচরণ ও সংলাপে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় সুস্পষ্ট। রূপকর্ম সাধিত হয়েছে। কৌতুকরস, এবং পঞ্চির ময়মনসিংহের ও খেঁদির বাঁকুড়া অঞ্চলের সংলাপ সবিশেষ উপভোগ্য। পঞ্চির মুখে ময়মনসিংহের ভাষার নমুনা,

> কমলিরে বোনডি। তোর পোলারে দুইট্যা মায়্যার সঙ্গেই বিয়া দিয়া দে। দ্যাহো দাদা, এইদুন এক চটকানা লাগাইমু যে উৎকা মাইয়্যা পইর‍্যা যাইব্যা! ওয়াব থুঃ! এ কি কয়, আমার বমি আইতেছে।[১১৬]

[১১৫] টীকা: ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে 'পুতুলের বিয়ে' নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে আরো কিছু ক্ষুদ্র নাটক ও কবিতা সংযোজিত হয়, সূচীপত্রে ছিল– পুতুলের বিয়ে, কালো জামরে ভাই, জুজু বুড়ীর ভয়, কে কি হবি বল, ছিনিমিনি খেলা, নবার নামতা পাঠ, সাত ভাই চম্পা ও শিশু যাদুকর। 'পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে' নামকরণ করা হয় ১৩৭০ বঙ্গাব্দে, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময়, সূচীপত্রে ছিল– খোকার খুশী, কে কি হবি বল, ফ্যাসাদ, মটুক মাইতি বাঁটকুল রায়, খোকার বুদ্ধি, বগ দেখেছো, খোকার গল্প বলা, নবার নামতা পাঠ, ঠ্যাংফুলী, পিলে পটকা, হোদল কুৎকুতের বিজ্ঞাপন, সংকল্প ও পুতুলের বিয়ে।

[১১৬] 'পুতুলের বিয়ে', কাজী নজরুল ইসলাম।

নজরুল তাঁর নাট্যকার-সুলভ নির্লিপ্ততা নিজের আয়ত্তে রেখে, নাট্যকর্মের সুঠাম গঠন করেছেন। গানগুলিও ছন্দে ও হাস্যরসের বৈচিত্র্যে বিশেষভাবে উপভোগ্য ও উপযোগী। এ-নাটকে নজরুলের শিশুসুলভ সরলচিত্তের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। শিশুর অন্তরের অনুভূতি দরদী মনে, একান্ত আপনা করে নিয়ে নজরুল অপূর্ব ছড়া ও গানে এ-নাটককে মুখর করে তুলেছেন। অবশ্য কোথাও কোথাও কাব্যোচ্ছ্বাসে সামঞ্জস্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

মিলন-গোধূলি রাঙা হয়ে এল ঐ
সোনার গগনময়।
দাও আশিস অভয়, হে দেব জ্যোতির্ময়।

এ নাকটটিতে শিল্পরীতির অপেক্ষায় সঙ্গীত-মাধুর্য ও কাব্য-রসের সমাবেশ বেশি।

মধুমালা: 'মধুমালা'[১১৭] 'মধুমালার গোড়ার কথা'য় (ভূমিকা) শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র লিখেছেন,

> ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের কথা– রঙমহল রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা কয়েকজন হ্যারিসন রোডে এ্যাফ্রেড রঙ্গমঞ্চে নাট্যভারতীর উদ্বোধন করি। এখন এই রঙ্গমঞ্চ গ্রেস্ সিনেমায় রূপান্তরিত হয়েছে। নাট্যভারতীর মালিক ছিলেন শ্রীরঘুনাথ মল্লিক ও রঙ্গমঞ্চের তত্ত্বাবধান করতেন তাঁর শ্বশুর স্বর্গীয় গদাধর মল্লিক। গদাধরবাবু একসময়ে আর্ট থিয়েটারের অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন ও তাঁর নাট্যপ্রীতি ছিল অসাধারণ। তাই গদাধরবাবু ও তাঁর পুত্র শ্রীমান বিদ্যাধর মল্লিক ও জামাতা শ্রীরঘুনাথ মল্লিক একত্রে যখন একটি খুব ভাল নাটক মঞ্চস্থ করাবার সংকল্প করলেন, তখন আমাদের হাতে প্রযোজনা করার মত কোন নাটক ছিল না।
>
> নাট্যভারতীর যিনি নামকরণ করেছিলেন সেই স্বনামখ্যাত নাট্যকার শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তখন নতুন নাটক রচনায় ব্যাপৃত; কিন্তু ইতিমধ্যে একটি ভাল নাটক কোথায় পাওয়া যায় তার জন্য অনুসন্ধান চলতে লাগলো।
>
> ইতিমধ্যে একদিন বন্ধুবর কাজী নজরুল আমায় বললেন যে তাঁর একটি ভাল গীতিনাট্য লেখা আছে। সেটি যদি আমি পরিচালনার জন্য গ্রহণ করি তা হ'লে তিনি খুশী হবেন।
>
> আমি বললাম, তুমি ভাই, আমায় পাণ্ডুলিপি পড়তে দাও, যদি মনে করি যে তার প্রযোজনা করা রঙ্গমঞ্চের পক্ষে সম্ভবপর, তাহলে আমরা অবিলম্বে তোমার নাটক নিয়েই কাজ শুরু করবো। নজরুল তার পরদিনই নাটকটি আমার হাতে দিলেন এবং সেই দিনই তা পড়ে আমি গদাধরবাবুকে শোনালাম। তিনিও গীতিনাট্যের রচনা প্রণালী দেখে মুগ্ধ হলেন। পরের দিনই বন্ধুবরকে আমি নিয়ে গেলাম তাঁর কাছে এবং মধুমালাকে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী ক'রে তোলবার জন্য নানারূপ পরিকল্পনা শুরু হয়ে গেল।
>
> কাজী স্বয়ং তাঁর গানের রচনায় সুর সংযোগ করতে এগিয়ে এলেন– তাঁর সুর শুনে গায়ক গায়িকারা মুগ্ধ হল রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।
>
> গীতিনাট্যের প্রযোজনা করা বাংলা রঙ্গমঞ্চের পক্ষে খুবই কঠিন। কারণ, সাজ-পোষাক, দৃশ্যপটের চমৎকারিত্ব, সংগীতের বিপুল আয়োজন, সবকিছুর জন্যে যে অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন, অনেক রঙ্গমঞ্চের মালিকের পক্ষে অত টাকা ব্যয় করা সব সময় সাধ্যায়ত্ত হয়ে ওঠে না। তবে গদাধরবাবু ও তার জামাতা রঘুনাথবাবু বললেন যে, খরচ করতে আমরা কার্পণ্য করবো না। সত্যি, খরচ করতে

[১১৭] টীকা: রচনাকাল: অগ্রহায়ণ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ। গ্রান্থাকারে প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ। প্রকাশক: জে. সি. সাহা রায়; বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা–১২। মুদ্রাকর: শ্রীগণেশ প্রসাদ সরাফ। মুদ্রক: মণ্ডল লিমিটেড, ১৭৬ মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলিকাতা: ৬। পৃষ্ঠা: ৯৪। মূল্য: ২.০০ টাকা।

তাঁরা পিছুপাও হননি সে সময়। সুপ্রসিদ্ধ রঙ্গশিল্পী মণীন্দ্রনাথ ঘোষ (নানুবাবুকে) মহাশয়কে তাঁরা দৃশ্যপট, আলোক নিয়ন্ত্রণের ভার দিলেন, পোষাক পরিচ্ছদ নতুনভাবে তৈরি করালেন, শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীমতী হরিমতিকে তাঁরা মূল গায়িকা হিসাবে নিযুক্ত করলেন, তাছাড়া সেযুগের নৃত্যগীত কুশলা অভিনয়দক্ষা শ্রীমতী সাবিত্রীকে মধুমালার ভূমিকায় অবতীর্ণ করাতে মনস্থ করলেন। রাজপুত্রের ভূমিকায় শ্রীজহর গাঙ্গুলী ও অন্যান্য ভূমিকায় স্বর্গীয় রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসন্তোষ সিংহ ও আরও কয়েকজন অবতীর্ণ হলেন। গানের ও নেপথ্য সুরের মুর্চ্ছনায়, দৃশ্যপটের অভিনবত্বে মধুমালা অপরূপ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হল।

কাজী স্বয়ং সুরের দিক ও আমি অভিনয়ের দিক দেখতে লাগলাম। সমস্ত দর্শক মুক্তকণ্ঠে মধুমালার প্রশংসা করতে লাগলেন কিন্তু ঐ সময় অপেরার বিপুল ব্যয়ভার গ্রহণ করার জন্য যে দর্শকের সমাগম হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল তা হল না। গীতিনাট্য চিরদিন লোকে অন্য নাটকের সঙ্গে দেখে এসেছে, কিন্তু এককভাবে গীতিনাট্য দেখতে লোক উৎসাহ বোধ করলে না। অথচ সাধারণ যে কোন নাটকের দ্বিগুণ পৃষ্ঠ-পোষকতা না থাকলে এই ধরণের আড়ম্বরপূর্ণ নাটক রঙ্গমঞ্চে চলে না। এছাড়াও সে-সময় বর্তমানকালের মত এতখানি রঙ্গমঞ্চের প্রতি প্রীতিও লোকের ছিল না– তাই চল্লিশ রাত্রি অভিনয়ের পর আমাদের আবার অন্য নাটক প্রযোজনা করতে হয়।

তবে একথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি বিদগ্ধ সমাজ কাজী সাহেবের এই গীতিনাট্য দেখে বিমুগ্ধ হয়ে আমাদের অবিমিশ্র প্রশংসা ক'রে গেছেন এবং সে সময় সঙ্গীত রসিক শিল্পবোধসম্পন্ন দর্শক-মহল অজস্র অভিনন্দন দিয়েছিলেন আমাদের।

মধুমালার কথা, পরীদের গান, সংলাপের ভাষা সব কিছু মিলিয়ে– এক মোহময় স্বপ্নাবেশের সূচনা হত প্রেক্ষাগৃহ। কবির রচনা সে সার্থক হয়েছিল তা সকলেই স্বীকার ক'রে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

দীর্ঘদিন পরে সেই গীতিনাট্যটি মুদ্রিত করে প্রকাশ রসিক পাঠকবর্গের ধন্যবাদার্হ হবেন সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।[১১৮]

'মধুমালা' একটি লোক-কাহিনী-মূলক নাটক। লোক-সংস্কৃতি থেকে নেওয়া এর কাহিনী। কাব্যধর্মী ও সংঘাতময়। সংলাপ স্বাভাবিকতাধর্মী।

এ নাটক ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। তারপর একাধারে চল্লিশ রাত। অভিনেতা ও অভিনেতীরা ছিলেন– জহর গাঙ্গুলী (রাজকুমার), সাবিত্রী (মধুমালা), রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। পরিচালনা করেছিলেন শ্রী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। সুর-সংযোজন করেছিলেন নজরুল নিজেই।

'মধুমালা'র কাহিনী কাল্পনিক। কাহিনীর মধ্যে রোমান্স ও এ্যাডভেঞ্চার পরিলক্ষিত হয়। লৌকিক ও মানবীয় চেতনা এ কাহিনীকে এক বিরল বৈশিষ্ট্য দান করেছে। রাজপরিবারকে কেন্দ্র করে এ-নাটকের আবর্তন। প্রেম-পাগল মদন-কুমার, প্রেমোন্মাদিনী কাঞ্চনমালা ও মধুমালার আকর্ষণ-বিকর্ষণ পাওয়া-না-পাওয়ার করুণ রসটি নিয়েই এ-নাটকটি রচিত হয়েছে। চারিত্রিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত এতে তেমন প্রবল নয়। ঘটনা-সংস্থান একান্তভাবেই শিথিল এবং নাটকীয় সূত্র আশানুরূপ দৃঢ়বদ্ধ নয়। এর সমস্ত ঘটনাবর্ত ও চরিত্রের সামান্যতম বাহ্যিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভেতর দিয়ে যেন সেই চিরভক্ত বাঙালি হৃদয়ের অতীন্দ্রিয় প্রেমাকাঙ্ক্ষাজনিত আর্তি ও কামনাই মুখর হয়ে উঠেছে। পাত্র-পাত্রীর পরস্পরের দেহ-সৌন্দর্যকে উপলক্ষ করে যে প্রেমের অঙ্কুর স্ফুটোনোন্মুখ, তাই পরিসমাপ্তিতে সমগ্র বাস্তব কামনা-বাসনা, ইন্দ্রিয়-অনুভূতির অতীত দেহাতীত প্রেমে পর্যবসিত হয়ে উঠেছে। জীবনের শেষমুহূর্তে কাঞ্চনমালা

[১১৮] 'মধুমালার গোড়ার কথা', শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, 'নজরুল রচনা-সম্ভার', কলিকাতা, ১৩৭৭।

বলে, 'যে তীর্থদেবতার দর্শনের আশায় আশায় এই পথের শেষে এসে পৌঁছলুম তাঁকে প্রণাম না করে গেলে যে আমার জলে স্নান করার আনন্দ হবে না ।'

নজরুলের দেশপ্রেমে উদ্বেলিত অন্তরের পরিচয়ও এ নাটকের অনেক স্থানে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন– রাজার সংলাপে, 'দুর্দণ্ড কি এর জন্য প্রস্তুত না হয়ে এসেছে মনে কর মন্ত্রী? এতদিন বাংলার ভাণ্ডার লুটে যে পাপ সঞ্চয় করেছে আজ তার শস্তি দেবো– সমুচিত শাস্তি দেবো । যাও সেনাপতি, যুদ্ধ করো– আমিও আসছি । মন্ত্রী, তুমি কুলললনাদের রক্ষা করো– যদি মগ জয়ী হয়– ওদের গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দিও ।'

'মধুমালা'র ভাষা চমৎকার । সুষমামণ্ডিত । গদ্যরীতিতে রচিত হলেও এর ছত্রে ছত্রে ছন্দের ঝঙ্কার ও কাব্যের লালিত্য অনুভূত হয় । যেমন, 'আসে আসে আমার সুন্দর রুদ্রের রূপে আসে । ঐ বিজলি শিখায় তার সোনার কাঁকনের ঝিলিক । ধূলি-গৈরিক গগন কোণে দোলে তার চন্দন-রং উত্তরীয় । পুঞ্জিত কালো মেঘে তার কেশভার ।'

শাস্ত্র জ্ঞানেরও সন্ধান পাওয়া যায় এ নাটকে । যেমন, 'অর্জ্জুনের মত স্বামী পেয়েছিলেন বলেই দ্রৌপদী সুভদ্রাকে বরণ করে ঘরে তুলেছিলেন । শ্রীকৃষ্ণের মত পতি পেয়েছিলেন বলেই রুক্মিণী তাঁর পতিকে পরিপূর্ণ চিত্তে সত্যভামার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন ।'